জ্যাক লন্ডন

শ্রেষ্ঠ গল্প

Edited By Fuad

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

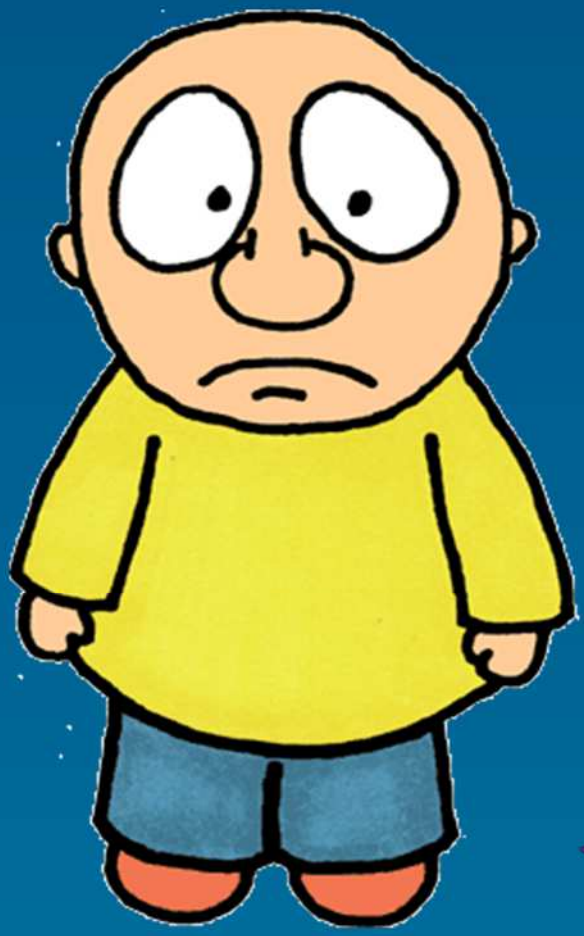

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৫৪
গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩ ▫ মে ১৯৯৬

প্রকাশক
রবিশঙ্কর মৈত্রী
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৮৬৮৫৬৭

কম্পিউটার কম্পোজ
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কম্পিউটার বিভাগ

মুদ্রণ
এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৭ শ্যামাপ্রসাদ রায়চৌধুরী লেন, ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
সরদার জয়নুল আবেদীন

মূল্য
পঞ্চাশ টাকা

ISBN 984-18-0153-0

ভূমিকা

মার্কিন লেখক জ্যাক লন্ডন (১৮৭৬—১৯১৬) তাঁর দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প আর হীন তুচ্ছ অবস্থা থেকে অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছোবার উদ্দীপনাময় কাহিনীসমৃদ্ধ ছোটগল্প এবং উপন্যাসের জন্য সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছে পরিচিত। সমসাময়িককালের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক জ্যাক লন্ডন আজও স্বদেশে এবং বহির্বিশ্বে বহুপঠিত একমাত্র মার্কিন লেখক হিসেবে বিবেচিত।

তাঁর জন্ম ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিসকোতে, ১৮৭৬ সালের ১২ জানুয়ারি। তাঁর মা ফ্লোরা ওয়েলম্যান, জনৈক ব্যবসায়ীর কন্যা এবং পিতা *অধ্যাপক ডব্লু এইচ চ্যানসি*, একজন ভবঘুরে জ্যোতির্বিদ। তাঁর আট মাস বয়সে তাঁর মা অধ্যাপক চ্যানসিকে ত্যাগ করে এক মধ্যবয়সী বিপত্নীক জন লন্ডনকে দুই কন্যাসহ বিয়ে করেন। তখন তাঁর নাম পরিবর্তিত হয়ে জ্যাক লন্ডন হয়।

প্রকৃত পিতার সঙ্গে কোনোকালে জ্যাকের কোনো পরিচয় না ঘটলেও তিনি উত্তরাধিকার সূত্রেই পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন সাহিত্যিক অন্বেষা, সমুদ্রপ্রেম এবং মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন ছাড়া সমাজের ব্যাধি দূর করা সম্ভব নয় জাতীয় একটি অনড় বিশ্বাস আর মনোবিকলনগ্রস্ত মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন কতকগুলো অস্বাভাবিক অঙ্ক প্রবণতা।

তাঁর যৌবন বয়সে সারা আমেরিকা জুড়ে নেমে এসেছিল অর্থনৈতিক মন্দার কাল। আমেরিকায় তখন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজের সন্ধানে ভবঘুরে জীবন গ্রহণ করছে, বাস করছে বাসের অযোগ্য বস্তিতে।

ফ্লোরা লন্ডনের মনে দ্রুত অর্থ বানানোর একটি গোপন লিপ্সা ছিল। অর্থ জমানোর অভিপ্রায়ে এবং কিছুটা বাধ্য হয়েই স্বামীর রুগ্ন স্বাস্থ্যসত্ত্বেও এই বিভীষিকার ক্রমাগত চাপে এরা বার বার অপেক্ষাকৃত কমভাড়ার বাড়িতে উঠতে থাকেন।

মা তাঁকে খুব অল্প সময় দিতেন, বরং মায়ের স্নেহ তিনি পেতেন মাম্মি জেনি নামের এক নিগ্রো মহিলার অকৃত্রিম সেবা আর সংবোন এলিজার ভালোবাসায়। এরাই ছিল তাঁর সারা জীবনের প্রিয় বন্ধু। স্বভাবে লাজুক ও আবেগপ্রবণ হওয়াতে নিজের দুর্ভাগ্যপীড়িত জীবন নিয়ে খুবই যন্ত্রণা পেতেন তিনি একসময় তিনি বলেছিলেন আমি এমন একজন বালক ছিলাম যার কোনো বাল্যকাল ছিল না।

চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই পরিবারকে তার আর্থিক সহযোগিতা করতে হত। তাঁর নিজের কথায়, 'আমার শৈশব কাটে ক্যালিফোর্নিয়ার কৃষিক্ষেত্রে, আমার বাল্যকাল কাটে একটি প্রাণপ্রাচুর্যময় পশ্চিমা শহরের রাস্তায় রাস্তায় সংবাদপত্র ফেরি করে, আমার কৈশোর কাটে স্যানফ্রান্সিসকো বে ও প্রশান্ত মহাসাগরের জলে ভেসে।' বস্তুত জীবনের শুরু থেকেই জীবিকার জন্য তাঁকে বহুবিধ কঠিন কাজ করতে হয়েছে। স্যানফ্রান্সিসকো উপসাগরে বেআইনী শুক্তি আহরণ ও চোরা চালানির কাজ করেছেন, কারখানায় শ্রমিকের কাজ করেছেন, জুসের কারখানায় প্রতি ঘণ্টা দশ সেন্ট হিসেবে প্রতিদিন আঠারো ঘণ্টার শ্রম বিকিয়েছেন, সিল মাছ শিকারি জাহাজে সিল শিকার করেছেন। কাজ করেছেন লন্ড্রিতে, স্বর্ণান্বেষীর দলে যোগ দিয়ে দুঃসহ কষ্ট সহ্য করেছেন, স্রেফ উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়িয়েছেন ভবঘুরের মতো, আর কারাবাসও করেছেন সমাজতান্ত্রিক একটি সভায় বক্তব্য রাখার দায়ে। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া তাঁর খুবই অল্প। এনট্রান্স পাস করে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন কিছুদিনের জন্যে। কিন্তু প্রথম পর্বের পাঠ শেষ হবার আগেই সামুদ্রিক জাহাজে চাকরি নিয়ে চলে যান।

জ্যাক লন্ডন মূলত কার্ল মার্ক্স, হার্বার্ট স্পেন্সর এবং ফ্রিডারিখ নিটশের দর্শনে প্রভাবিত হয়ে নিজের অভিজ্ঞতার জগৎটিকে অনুরূপ ব্যাখ্যা দেবার ব্যাপারে আত্মনিবেশ করেন। তাঁর সাহিত্যিক জীবন তুলনামূলকভাবে খুবই সংক্ষিপ্ত বলা যায়।

বিপদসঙ্কুল রোমাঞ্চকর দুঃসাহসী বিষয় নিয়ে লেখা সেই সময়ের একটি সাধারণ লক্ষণ ছিল এবং জ্যাক লন্ডন সে-ধরনের রোমাঞ্চকর গল্প লিখেই লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *দ্য সান অফ দ্য উলফ* (১৯০০) একটি ছোটগল্পের সংকলন। জীবনের পরবর্তী সতেরোটি বছরের প্রতি বছরই তাঁর দুই অথবা তিনটি করে বই প্রকাশিত হয়।

অর্থাৎ সতেরো বছরের সাহিত্য জীবনে উনিশটি উপন্যাস, আঠারটি ছোটগল্প ও প্রবন্ধ সংকলন, তিনটি নাটক ও আত্মজীবনী এবং সমাজ বিষয়ক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। এর মধ্যে শিল্প হিসেবে সফল, জনপ্রিয় এবং তাঁর সেরা গ্রন্থটির নাম *দ্য কল অফ দ্য ওয়াইল্ড* (১৯০৩)। বন্ধনহীন উদ্দাম অকপট প্রবাহের মধ্যেই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ উল্লাস নিহিত জ্যাক লন্ডন তাঁর এই বিশ্বাসটি *দ্য কল অফ দ্য ওয়াইল্ডের* প্রধান চরিত্র বাক (একটি কুকুর)-এর মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাক নামক একটি কুকুর এর নায়ক। সে বন্য কুকুর। মানুষের সংস্পর্শে এসে সে দেখে সভ্য মানুষের জীবন সংগ্রামের মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে হিংস্রতা আর হানাহানি। অতএব সে বন্য নেকড়ে দলের সঙ্গে অরণ্যে ফিরে যাওয়াই শ্রেয় মনে করে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সম্পর্কে জ্যাক লন্ডনের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

এই জাতীয় আরেকটি সফল অনতিদীর্ঘ উপন্যাসের নাম *হোয়াইট ফ্যাঙ* (১৯০৬); এখানে লন্ডন কাহিনীটিকে একটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করেন। একটি বন্য নেকড়েকে গৃহপালিত প্রাণীর স্বভাবে চিত্রিত করেন। এইসব কাহিনীর মধ্যে দিয়ে জ্যাক লন্ডন দেখাতে চান মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকারের বাসনা কীভাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও বন্ধনের মাধ্যমে লাঞ্ছিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার সারিতে আরো দুটি উপন্যাস রয়েছে। *দ্যা সিউলফ* (১৯০৪), এবং *মার্টিন ইডেন* (১৯০৯)। *দ্যা সি-উলফ* এর নায়ক, জাহাজের ক্যাপটেন লারসেন-কে জ্যাক লন্ডন এঁকেছেন একজন মনুষ্য ব্যাঘ্র হিসেবে, মানুষটি নির্ভীক হিংস্র সুন্দর এবং গতানুগতিক ন্যায়নীতি ও বিবেকের অনুশাসনের প্রতি যার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা, ভক্তি কিংবা আনুগত্য নেই, জীবনের প্রতি আদিম দুর্বার ভালোবাসায় যে সারাক্ষণ টগবগ করে ফুটছে। *মার্টিন ইডেন* তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাস যার পরতে পরেত জ্যাক লন্ডনের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই উপন্যাসের নায়ক একজন জাহাজের নাবিক, জ্ঞান ও শক্তির দুর্বার আকাঙ্ক্ষা যাকে একজন লেখক হিসেবে প্রথমে সাফল্য এনে দেয়। কিন্তু পরে যার মোহভঙ্গ ঘটে চোখ ধাঁধানো সামাজিক সভ্যতার বিবিধ স্খলনে, এবং শেষ পর্যায়ে আত্মহত্যায় নিবৃত্তি খুঁজে পায়। এই উপন্যাস এবং কতিপয় প্রবন্ধে *[দ্যা পিপল অফ দ্যা অবিস* (১৯০৩)] জ্যাক লন্ডন সরাসরি ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে আঘাত করেছেন।

জ্যাক লন্ডন দুবার বিয়ে করেন, কিন্তু কোনো স্ত্রীই তাঁর পুত্রসন্তানের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে নি। লেখালেখি থেকে তাঁর আয় যত বেড়েছে ঋণের বোঝা ততো হয়ে উঠেছে বিপুল। নিজের পরিবার ছাড়াও চেনা-অচেনা আত্মীয়-স্বজন পরগাছার মতো তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে আর সবটুকুই তিনি বহন করেছেন।

অতিরিক্ত পরিশ্রম ও ক্লান্তির শিকার হয়ে জ্যাক লন্ডন মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে ইউরেমিয়ায় আক্রান্ত হন, মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তিনি মরফিন ও এট্রোফিনের একটি প্রাণনাশক মিশ্র ডোজ সেবন করে মৃত্যুকে গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র চল্লিশ, তারিখ ২২, সন নভেম্বর, ১৯২২।

এই গ্রন্থে জ্যাক লন্ডনের অতি পরিচিত এবং আলোচিত পাঁচটি গল্প বেছে নেয়া হয়েছে। দুর্বার গতিতে, প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ততায়, জীবন ও প্রকৃতির প্রতি আদি ও অকৃত্রিম ভালোবাসায় এই গল্পগুলো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। উদ্দীপিত করার এক সহজাত গুণ ছিল জ্যাক লন্ডনের—পাঠককে যা সহজেই শুধু সংক্রমণ করে না তাড়িতও করে। সংকলিত গল্পগুলো স্বভাবে এমনই।

শহিদুল আলম

সূচি

জীবন তৃষ্ণা ৭
বিধর্মী ২৪
আগুন জ্বালতে হলে ৪১
গল্পের শেষে ৫৪
এক টুকরো মাংস ৭৩

জীবন তৃষ্ণা

সব কিছু মুছে গিয়েও থাকে কিছু—
ওরা যে হেসেছে, খেলেছে, ফেলেছে দান।
জীবনের পাশা খেলায় এইটুকুই লাভ,
সোনার ঘুঁটিটা না হয় গেলই হারিয়ে।

তীর ধরে ওরা দুজনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোচ্ছিল। খুব কষ্ট হচ্ছিল ওদের হাঁটতে। আগের জন টাল সামলাতে না পেরে ছড়ানো পাথরের ওপর হঠাৎ আছড়ে পড়ল। দুজনেই অত্যন্ত ক্লান্ত এবং দুর্বল। দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট সহ্য করে করে ওদের মুখে ফুটে উঠেছে সহিষ্ণুতার কঠিন এক অভিব্যক্তি। কম্বলের গাঁটের বিরাট এক একটি বোঝা ওদের পিঠে ফিতে দিয়ে বাঁধা। দুজনের হাতেই একটি করে বন্দুক। আনত ওদের ভঙ্গি, কাঁধ দুটো সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে, মাথাটা আরো বেশি। দৃষ্টি মাটির ওপর নিবদ্ধ।

আমাদের বোঁচকাটার মধ্যে মাত্র দুটো করে যদি কার্তুজ থাকত তো খুব ভালো হত। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল। বিষণ্ন, অনুভূতিহীন কণ্ঠস্বর। আগ্রহশূন্য উক্তি।

পাথরের ওপর প্রবহমান ফেনিল জলস্রোত। প্রথম ব্যক্তি সদ্য তখন ঘুঁড়িয়ে ঘুঁড়িয়ে নেমেছে সেই জলস্রোতের মধ্যে তাই প্রশ্নের উত্তর দেবার কোন তাগিদ অনুভব করল না সে। অন্যজন ওর পিছু পিছু চলেছে। হিম শীতল জল। এত ঠাণ্ডা যে হাঁটুতে তীব্র যন্ত্রণা হতে থাকে, পা দুটো ক্রমশ অসাড় হয়ে আসে। জুতো মোজা পরেও এই অবস্থা। মাঝে মাঝে ওদের হাঁটুর ওপর জল আছড়ে পড়ছে। ঠাণ্ডায় ভারসাম্য হারিয়ে দুজনেই পা রাখার মতো একটু জায়গা খোঁজে।

মসৃণ এক টুকরো পাথরে পা পড়তেই পেছনের লোকটির পা পিছলে গেল। আরেকটু হলেই পড়েছিল আর কি! কোনো রকমে সামলে নেয় নিজেকে। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে ওর কণ্ঠস্বর। মনে হয় ওর মাথা ঘুরছে, বিভ্রান্ত। টলমল করতে করতে একটা অবলম্বন খোঁজার জন্যে বাতাসের গায়েই একখানা হাত বাড়িয়ে ধরে। সামলে উঠে আবার এক পা এগোয় কিন্তু ফের মাথা ঘুরে আছড়ে পড়ার উপক্রম হয়। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ও একবার সঙ্গীর দিকে তাকায়। ওর সঙ্গী কিন্তু একবারও ঘাড় ফেরানোর প্রয়োজন বোধ করে নি।

পুরো এক মিনিট লোকটি ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। ভাব দেখে মনে হয় যেন নিজের সংগে তর্ক করছে ও। তারপর চেঁচিয়ে বলল—এই বিল, আমার গোড়ালিটা মচকে গেছে রে!

বিলের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। পেছন ফিরে একবার তাকালেও না। শুভ্র ফেনিল জলস্রোতের মধ্যে টলমল করে তখন সে এগিয়ে চলেছে একমনে। পেছনের লোকটি সঙ্গীর দিকে চেয়ে থাকে, ভাবলেশহীন মুখ, চোখে আহত হরিণের দৃষ্টি।

বিল ঘুঁড়িয়ে ওপারে ওঠে। উত্তাল জলস্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ও লক্ষ্য করে বিলকে। ঠাণ্ডায় ওর ঠোঁট দুটো থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে। ঠোঁট ঢাকা গোঁফের ঝাড়টিও নেচে ওঠে তালে তালে। জিভ বার করে ও ঠোঁট দুটোকে ভিজিয়ে নেয় অন্যমনস্ক ভাবে কয়েকবার।

চেঁচিয়ে ডাকে, বিল!

দুর্দশা কবলিত একটি সবল মানুষের আর্ত আবেদন। তবু বিলের মাথা পিছন ফিরল না।

বিল এগিয়ে চলেছে। বাধোবাধো টলমলে চলন ভঙ্গি। বিচিত্র ভাবে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চড়াইটা পেরোচ্ছে। নিম্নভূমির পাহাড়টার মোলায়েম আকাশ সীমারেখার দিকে নজর রেখে এগিয়ে চলেছে। শিখর পেরিয়ে বিল যতক্ষণ না চোখের আড়াল হল ততক্ষণ ও চেয়ে থাকে। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। বিল চলে গেছে দৃষ্টির বাইরে। এখন ওর সঙ্গী বলতে শুধু নিঃশব্দ জাগতিক পরিমণ্ডল।

দিগন্ত পারে ধীর প্রজ্জ্বলিত ম্লান সূর্য ঘন কুয়াশার আবরণে ঢাকা পড়ে আরো ম্লান হয়ে যায়। সীমারেখাহীন স্পর্শাতীত বিচিত্র এক জড় জগৎ। লোকটি এক পায়ে ভর রেখে পকেট থেকে ঘড়ি বার করে। চারটে বেজেছে। বুঝতে পারে, সূর্য উত্তর পশ্চিম দিক-নির্দেশ করছে কারণ, সময়টা এখন খুব সম্ভব জুলাইয়ের শেষভাগ কি আগস্টের গোড়ার দিক। হিসাবে দু-এক সপ্তাহের হেরফের এড়ানো বর্তমানে ওর পক্ষে অসম্ভব। লোকটি দক্ষিণে তাকায়। ও জানে ওই জনশূন্য পাহাড়গুলোর ওপারে কোনো এক জায়গায় গ্রেট বিয়ার লেক। তাছাড়া ওই দিকেই যে কোথাও কানাডিয়ান ব্যারেন্‌স্‌-এর মাঝ দিয়ে আর্কটিক সার্কেলের ভয়াবহ বিস্তৃতি, এও জানে। যে নদীটিতে ও এখন দাঁড়িয়ে সেটি কপার মাইনস নদীকে পুষ্ট করেছে এবং শেষোক্তটি দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে করোনেশান খাঁড়ি ও আর্কটিক সাগরে নিজেকে উজাড় করেছে। ওখানে কখনো ও যায় নি বটে তবে হাডসনস বে কোম্পানির চার্টে অঞ্চলটা একবার দেখেছিল।

যতদূর দৃষ্টি যায় চারিদিকেই আরেকবার চোখ বোলায় লোকটি। সর্বত্রই কোমল আকাশ-রেখা। দৃশ্যটি এমন কিছু উৎসাহোদ্দীপক নয়। প্রতিটি পর্বত নিম্নভূমি ছুঁয়ে আছে। গাছপালা ঝোপঝাড় থাকা তো দূরের কথা, ঘাসের ডগাটিরও চিহ্ন নেই কোথাও—থাকার মধ্যে আছে শুধু ভয়ানক এক নির্জনতা। ওর দু-চোখে তারই দ্রুত প্রতিফলন।

বিল! বিল! ফিসফিস্‌ করে বার কয়েক উচ্চারণ করে নামটা।

দুধগোলা ঘোলাটে জলের মধ্যে কুঁজো হয়ে দাঁড়ায় লোকটি। চারিদিকের সীমাহীন বিশালতা ওকে যেন গ্রাস করে। বিশালত্বের অসহনীয় ভয়াবহতা ওকে নির্মমভাবে পোষণ করে। পালাজ্বরগ্রস্ত রোগীর মতো ও কাঁপতে শুরু করে। কাঁপতে কাঁপতে এক সময় রাইফেলটা হাত থেকে খসে পড়ে যায়। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে নিজের ভয় ভাঙাতে চেষ্টা করে লোকটি। জল হাতড়ে রাইফেলটাকে উদ্ধার করে। আহত গোড়ালিটার ক্ষত বাঁচিয়ে সতর্কভাবে ধীরে ধীরে তীরের দিকে এগোতে থাকে।

আঘাত ও ক্ষতের যন্ত্রণা, শরীরের সব ক্লান্তিকে উপেক্ষা করে একটানা বদ্ধ উন্মাদের মতো এগিয়ে চলেছে—লক্ষ্য তার পর্বতের শিখরদেশ। এরই ওপারে তার সঙ্গীটি কিছুক্ষণ আগে অন্তর্হিত হয়েছে। টলমলে পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এক সময়ে ও পর্বতের শিখর দেশে এসে হাজির হয়। শিখরে তো পৌঁছনো গেল কিন্তু সামনেই যে অগভীর এক উপত্যকা। জীবনের কোনো চিহ্ন সেখানে চোখে পড়ে না! জলাসিক্ত পিচ্ছিল এই উৎরাই পেরোনো কি সহজ কাজ। মরিয়া হয়ে ওঠে লোকটি।

সঙ্গীহীন হলেও ও কিন্তু পথভ্রষ্ট নয়। জানে, উপত্যকা পেরিয়ে খানিক দূর এগোলে ছোট একটা দীঘির কাছে পৌঁছবে। গ্রাম্য ভাষায় দীঘিটির নাম টিচিনিচিলি অর্থাৎ কচি-কচ্চির দেশ। দীঘির পাড় ঘিরে ছোট ছোট শুকনো পাইন আর ফারের সারি। এখানে একটা নদী এসে পড়েছে। এর জল সুস্বাদু, দুধগোলা ঘোলাটে নয়। বেশ মনে আছে,

নদীটির দু-তীরে নল খাগড়ার বন। ওকে এই নদীব তীর ধরেই এগোতে হবে। যেখান এই নদীটি বাঁক নিয়েছে সেখানে না পৌঁছে ও থামবে না। নদীর এই বাঁকের মুখ থেকে পশ্চিমে আর একটি নদী প্রবাহিত হয়েছে। এই জলধারাটি ডিঙ্গে নদীতে গিয়ে পড়েছে। এই দুই জলধারার সংযোগস্থলে অনেক পাথর দিয়ে চাপা একটা উপুড় করা নৌকার তলা থেকে ও একটা বোঁচকা পাবে। এই বোঁচকার মধ্যে আছে শূন্য রাইফেলটার জন্যে কিছু টোটা, বড়শি, ছিপ্ আর একটা ছোট জাল। খাদ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম। খুব বেশি না হলেও খানিকটা ময়দা মিলবে। সেইসঙ্গে কিছু বিন্ আর এক টুকরো বেকন।

ওখানে বিল অপেক্ষা করবে। ডিঙ্গে নদীতে নৌকা বেয়ে ওরা দুজনে গ্রেট বিয়ার লেকে পৌঁছবে। তারপর লেক পেরিয়ে দক্ষিণ মুখে রওনা দেবে। ম্যাকেঞ্জি নদীতে না পৌঁছনো পর্যন্ত ওদের গতি দক্ষিণ মুখেই অব্যাহত থাকবে। ওখানে পৌঁছে আবার দক্ষিণে। হাড় কাঁপানো শীত ওদের পিছু ধাওয়া করে করুক, নদীর ঘূর্ণিজলে বরফ দেখা দেয় দিক, তবু ওদের চলার গতি থামবে না। সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে উপেক্ষা করে ওদের মনের জোরই ওদের গন্তব্যস্থলে এগিয়ে দেবে। দক্ষিণে হাডসন বে কোম্পানীর উষ্ণ কোনো অঞ্চলে পৌঁছে ওরা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে। এ অঞ্চল অরণ্য সম্পদে ঐশ্বর্যময়ী, পর্যাপ্ত খাদ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। পেট পুরে খেয়েও শেষ করা যাবে না কিছুতে।

দুর্গম যাত্রপথ, কষ্টকর পথ পরিক্রমা, তাই মনকে তাগদ যোগাতে নানারকম চিন্তার জাল বুনে চলেছিল লোকটি। শরীরের সঙ্গে মনও লড়াই চালাচ্ছিল সমান তালে। ও কল্পনা করতে চায়, বিল ওকে একেবারে পরিত্যাগ করে যায় নি, রসদের বোঁচকাটার কাছে বসে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে ওব জন্যে। একথা ভেবে ওর উপায় নেই। কেননা এই পরিশ্রমের তাহলে আর কোনো অর্থই থাকে না। আর সেক্ষেত্রে মৃত্যুকেই স্বীকার করে নিতে হয়। তা ও পারবে না।

ম্লান সূর্যের রক্তাক্ত গোলাটা উত্তর পশ্চিমে ধীরে ধীরে অস্ত যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই লোকটি এক পা এক পা করে মনে মনে অনেকবার বিলের সঙ্গে পাড়ি দিয়ে ফেলেছে দক্ষিণের দিকে। হাডসন বে কোম্পানির পোস্টে আর বোঁচকাটার মধ্যে কী কী রসদ আছে তার তালিকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবতে থাকে লোকটি। দুদিন খাওয়া হয় নি। আর মনমতো খাওয়ার সাধ তো অপূর্ণ রয়েছে বহু দিন। মাঝে মধ্যেই ঝুঁকে পড়ে বিবর্ণ মাসকেগ বেরি কুড়িয়ে নিয়ে মুখে পুরে চিবাচ্ছে লোকটি। ও জানে এই বেরিতে কোন পুষ্টি নেই। তাতে কী! অর্জিত জ্ঞানের চেয়ে ক্ষুধা অনেক সত্যি। তাই অভিজ্ঞতাকে তুচ্ছ করে জলভরা তেতো মাসকেগ বেরি চিবিয়ে চলেছে।

তখন প্রায় ন'টা হবে। ছোট্ট একটা পাথরে পায়ের আঙুলটা ঠুকে গেল। ক্লান্ত দুর্বল শরীর, টাল সামলাতে না পেরে লোকটি হুড়মুড়িয়ে পড়ে মাটিতে। পাশ ফিরে খানিকক্ষণ নিশ্চলভাবে শুয়ে থাকে ও। তারপর বোঁচকার বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে কোনোক্রমে ঘষড়ে ঘষড়ে উঠে বসার চেষ্টা করে। এখনো তেমন অন্ধকার হয় নি। যাই যাই করেও গোধূলির ম্লান আলো ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। সেই আলোয় পাথরের ফাঁকে ফাঁকে শুকনো শ্যাওলার সন্ধানে এদিক ওদিক হাতড়ায় লোকটি। শ্যাওলার ছোট্ট একটা স্তর জড়ো হলে তাতে আগুন জ্বালে। জল ফোটাবে বলে একটা টিনের পাত্রে করে খানিকটা জল বসায় আগুনে। আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে আর প্রচুর ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

বোঁচকা খুলেই সর্বপ্রথমে দেশলাই কাঠি গুনতে শুরু করে লোকটি। সাতষট্টিখানা রয়েছে। নিশ্চিত হতে তিন তিনবার গোনে কাঠিগুলোকে। শেষে ভাগ ভাগ করে

কাঠিগুলোকে অয়েল-পেপারে মুড়ে ফ্যালে। এক ভাগ রাখে তামাকের থলিটায়। এক ভাগ ভাঙাচোরা টুপিটার ভিতরকার ফেট্টিটায় তলায়, আর তৃতীয় ভাগ রাখে সাটের নিচে বুকের মধ্যে। কাজটি শেষ হবার পর আবার ওর ভয় করে, সব কটা মোড়ক খুলে ফেলে ফের গোনে। সেই সাতষট্টিখানাই রয়েছে।

আগুনের ধারে ভিজে জুতো-মোজা রেখে শুকিয়ে নিয়েছে। মোকাসিনটার একেবারে শতছিন্ন অবস্থা। কম্বলের তৈরি মোজার জায়গায় ফুটো, পা দুটো একেবারে রগরগে। রক্ত পড়ছে। গোড়ালিটা দপদপ করছে বলে একবার পরীক্ষা করে—ফুলে উঠে প্রায় হাঁটুর আকার ধারণ করেছে। কম্বল দুটোর একটা থেকে লম্বা করে একটা ফালি ছিঁড়ে নিয়ে গোড়ালিটায় কষে বাঁধে। আরো কয়েক ফালি ছিঁড়ে পায়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়ায়, মোকাসিন আর মোজা দুইয়ের কাজ করবে। বাটি ভরে ফুটন্ত জল পান করে, ঘড়িতে দম দিয়ে কম্বলের তলায় গুড়ি মেরে ঢুকে পড়ে।

লোকটি মড়ার মতো ঘুমোচ্ছিল। মাঝ রাত বরাবর কিছুক্ষণের জন্যে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে তারপরই অন্ধকার কেটে যায়। উত্তর পূর্ব কোণে সূর্য ওঠে। ধূসর মেঘের আড়ালে ঢাকা মলিন সূর্য, কাজেই দিন শুরু হয়েছে কেবল ওদিকের অংশেই।

ছটার সময় লোকটির ঘুম ভাঙল। ও তখনও শান্তভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে। দৃষ্টি গিয়ে পড়ে ধূসর বর্ণ আকাশের দিকে। বুঝতে পারে ক্ষিদে পেয়েছে। কনুইয়ে ভর দিয়ে উপুড় হতেই একটা নিশ্বাস ফেলার মতো শব্দ কানে আসে। চমকে দ্যাখে পঞ্চাশ ফুট দূরে একটা বলগা-হরিণ সতর্ক ও কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ্য করছে। সঙ্গে সঙ্গে সেঁকা ও ঝলসানো এক টুকরো বলগা-হরিণের মাংসের রূপ আর স্বাদের কথা মনে পড়ে। যন্ত্রচালিতের মতো শূন্য বন্দুকটার দিকে হাত বাড়ায় লক্ষ্য স্থির করে ঘোড়া টেপে। হরিণটা ঘোঁৎ করে উঠে লাফ মেরে পালায়। পাথরের টুকরো পেরিয়ে ছোটার সময় খট-খট করে আওয়াজ হয় খুরে।

লোকটা গাল পেড়ে ফাঁকা বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে সরবে কাতরে ওঠে। কাজটা শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। দেহের প্রতিটি গ্রন্থির অবস্থা মরচে ধরা কব্জার মতো। দৈহিক কব্জাগুলো বাধো বাধো ভাবে কাজ করছে। ঘর্ষণ প্রক্রিয়া বেশ প্রকট। প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো নাড়াচাড়া করা সম্ভব হচ্ছে। পায়ে ভর রেখে দাঁড়াবার পর মিনিটখানেক লেগে গেল দেহটাকে সোজা করতে।

ছোট্ট একটা ঢিপির ওপর উঠে গুড়ি মেরে আশপাশ লক্ষ্য করল লোকটি। গাছ নেই, ঝোপঝাড় অবধি নেই। থাকার মধ্যে কেবল ধূসর শ্যাওলার অরণ্য। মাঝেমধ্যে এক আধটা ছোট্ট নদী কিংবা সরোবর চোখে পড়ে। আকাশেরও ধূসর বর্ণ। সূর্য নেই। এমন কি তার অস্তিত্বের কোনো ইঙ্গিতও নেই। লোকটি আন্দাজ করতে পারে না কোনটা উত্তর দিক। তাছাড়া কোন পথ ধরে গত রাত্রে এই জায়গাটিতে এসেছে তাও ভুলে গেছে সে। তবে এটা ভালো করেই জানে যে পথ হারায় নি। শিগগিরই কচি-কঞ্চির দেশে পৌঁছতে পারবে। অনুভব করে জায়গটা বাঁদিকে কোথাও, খুব দূরেও নয়—সম্ভবত নিচু পাহাড়টার ওপারেই।

বোঁচকাটার আকার ভ্রমণের উপযোগী করে তোলার জন্যে ফিরে আসে। নিজেই নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে দেশলাইয়ের কাঠি গুনতে গিয়ে সে খুব একটা বেশি সময় নষ্ট করে নি। সময় নষ্ট হয়েছে হরিণের চামড়ার পেটমোটা থলিটা সম্বন্ধে মনস্থির করতে গিয়ে। থলিটা খুব একটা বড় নয়। দুহাত এক করলে তার তলায় অনায়াসে এটাকে ঢেকে রাখতে পারে। কিন্তু ওজন প্রায় পনের পাউণ্ড। জিনিসপত্র সমেত পুরো বোঁচকার

ওজনের সমান। ভাবনাটা এই কারণেই। অনেক ভেবে চামড়ার ব্যাগটাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে বোঁচকার জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করে। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে ফের চামড়ার ব্যাগটার দিকে তাকায়। তারপর এক হেঁচকায় ব্যাগটাকে মাটির ওপর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বোঁচকায় পোরে। দেখে মনে হয় চরিদিকের জনশূন্যতাই বুঝি চোরের মতো ওর কাছ থেকে ব্যাগটাকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। বোঁচকাটাকে কাঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটি। ধীর পায়ে যাত্রা শুরু করল দিনটির মোকাবিলা করতে।

লোকটি এখন বাঁ দিক বরাবর চলতে শুরুতে করেছে। মাঝে মাঝে মাসকেগ বেরি খাবার জন্যে চলায় ছেদ পড়ছে। গোড়ালিটা আড়ষ্ট, খোঁড়ান ভাবটা আরো প্রকট হয়েছে। তবু এ যন্ত্রণা পেটের যন্ত্রণার কাছে অতি নগণ্য। ক্ষিধের জ্বালায় পেটটা মোচড় দিয়ে উঠছে বারবার। ক্রমাগত পেট কামড়ানির ফলে যে পথ দিয়ে ওকে কঙ্কির দেশে পৌছতে হবে, তার ওপর আর স্থিরভাবে মনসংযোগ করতে পারে না সে। মাসকেগ বেরি পেটের জ্বালার উপশম ঘটাতে তো পারেই না উল্টো তার কঠিন দংশনে জিভ আর মুখের তালু জ্বালা করে।

একটা উপত্যকায় এসে পৌছল লোকটি। দেখতে পেল, পাহাড়ি মুরগির দল মাসকেগ বেরি আর শৈল স্তবক ছেড়ে ডানা ঝাপটে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। ক্যার, ক্যার, ক্যার শব্দ করে ওরা উড়ছে। পাখিগুলোকে লক্ষ্য করে একটা পাথর ছোঁড়ে কিন্তু আঘাত করতে পারে না। বোঁচাকাটাকে মাটির ওপর নামিয়ে রেখে, বেড়াল যেমন গুটি গুটি পায়ে এগোয় ঠিক তেমনি করে গুটি গুটি পায়ে সন্তর্পণে পাখিগুলোর নিকটবর্তী হয়। চোখা পাথরের খোঁচায় ওর প্যান্ট ছিন্ন হয়, শেষ পর্যন্ত হাঁটু থেকে রক্ত ঝরে চলার পথটি চিহ্নিত হতে থাকে। কিন্তু এ-জ্বালা ক্ষুধার জ্বালায় চাপা পড়ে যায়। ভিজে শেওলার ওপর সর্পিল ভঙ্গিতে বুকে হাঁটে, জামাকাপড় ছিন্নভিন্ন, সারা দেহ হিম—কিন্তু খাদ্য সংগ্রহের উন্মাদনায় কিছুই অনুভব করে না। একটার পর একটা পাহাড়ি মুরগি কেবলই ওর সামনে দিয়ে ডানা ঝাপটে আকাশে পাড়ি জমাচ্ছে। শেষ অবধি ওদের ক্যার, ক্যার, ক্যার ডাকটা ভেঙচি কাটার মতো লাগে। পাখিগুলোকে গাল পেড়ে সরবে ওদেরই ডাকের অনুকরণ করে।

হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে এগোতে হঠাৎ একটা পাখির একবারে ওপরে এসে পড়ে লোকটি। পাখিটা বোধহয় ঘুমিয়ে ছিল। পাখিটাকে ও দেখতেও পায় নি। পাথরের খোঁদলে নিজের আশ্রয় ছেড়ে ঠিক ওর নাকের সামনে দিয়ে পাখিটা চম্পট দিল। মুরগিটার মতোই চমকে গিয়ে লোকটি হাত বাড়িয়ে ওটাকে ধরতে চাইল, কিন্তু পাখিটার পরিবর্তে ওর লেজের তিনটে পালক কেবল বদ্ধ মুঠোর মধ্যে রয়ে গেল। পলাতক পাখিটার দিকে চেয়ে ওটার ওপর ঘৃনা জাগে যেন দারুণ একটা গর্হিত কাজ করেছে। তারপর ফিরে এসে ফের বোঁচকাটা কাঁধে তুলে নেয়।

দিনের অনেকখানি পার হয়েছে। নানা উপত্যকা পেরিয়ে একট ঝোপঝাড় ভরা অঞ্চলে এসে পৌছায় লোকটি। এখানে শিকার মেলার সুযোগ আরো বেশি। বন্দুকের আওতার মধ্যে দিয়ে খুব লোভনীয়ভাবে বিশ ত্রিশটা বলগা হরিণের একটা দল পেরিয়ে গেল। একটা বন্য আকাঙ্ক্ষা লোকটিকে পেয়ে বসে—ওগুলোর পিছু ধাওয়া করার ইচ্ছে। ছুটে গেলে ঠিক ওদের ধরে ফেলতে পারবে। একটা কালো শেয়াল এবার ওর দিকে এগিয়ে আসে, শেয়ালটার মুখে একটা পাহাড়ি মোরগ। লোকটি চেঁচিয়ে ওঠে। ভয় পাওয়ানো চিৎকার। চিৎকার শুনে শেয়ালটা ভয় পেয়ে পালায় ঠিকই, কিন্তু মুরগিটাকে ফেলে যায় না কোনোমতেই।

পড়ন্ত বিকেলের দিকে চুন-গোলা দুধরঙা একটা নদী ধরে হাঁটতে শুরু করে লোকটি।

নদীটা নলখাগড়ার ঝোপগুলোর মাঝ দিয়ে বইছে। নলখাগড়াগুলোকে শক্ত হাতে গোড়ার কাছে চেপে ধরে উপড়ে নেয়—দেখতে অনেকটা সদ্য গজানো পেঁয়াজের মতো। বস্তুটি নরম, চট করে দাঁত বসে যায়, তাই প্রথমে মনে হয় খেতে সুস্বাদুই হবে। আসলে আঁশগুলো কিন্তু শক্ত। উদ্ভিদটি জলসিক্ত কিছু রোঁয়াব সমষ্টি। ঠিক বেরিরই মতো, কোনো পুষ্টি নেই। বোঁচকাটা ছুঁড়ে ফেলে লোকটি চার হাতে পায়ে ষাঁড়ের মতো নলখাগড়ার ঝোপে ঢুকে কচমচ করে চেবাতে শুরু করে দেয় সেগুলোকে।

অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কেবলই শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করছে। তবু ক্রমাগত এগিয়ে যেতে হয়। অবশ্য এর পেছনে 'কঙ্কির দেশ—এ পৌঁছানোর প্রবল ইচ্ছে যতটা কাজ করছে তার চেয়ে বেশি করছে ক্ষুধার তাড়না। ছোট পুকুরগুলোর ব্যাঙের সন্ধান করে, কীটের সন্ধানে নোখ দিয়ে মাটি খোঁড়ে অথচ এত উত্তরে ব্যাঙ ও কীটের যে কোনো অস্তিত্ব নেই তা ও ভালোভাবেই জানে।

মিথ্যেই প্রতিটি পুকুরের মধ্যে চেয়ে চেয়ে দেখা। অবশেষে গোধূলির প্রথম লগ্নে একটি পুকুরে সাক্ষাৎ মিলল 'মিনো' নামে ক্ষুদ্র আকারের একটি মাছের। কাঁধ অবধি পুরো হাতটা সোজা জলের মধ্যে চালিয়ে দিল, মাছটা কিন্তু ওকে ঠকিয়েছে। তবু উন্মাদের মতো জলের মধ্যে ও দুহাত ঢুকিয়ে খুঁজে চলে, জলের তলাকার দুধরঙা কাদা গুলিয়ে ওঠে। উত্তেজনার মাথায় লোকটা শেষে জলে পড়ে যায়। কোমর অবধি ভিজে গেছে। জলটা এত গুলিয়ে গেছে যে মাছটাকে দেখতে পাবার আর কোনো আশাই নেই। যতক্ষণ না কাদা থিতোচ্ছে ততক্ষণ অপেক্ষা করতেই হবে।

খানিকক্ষণ বাদে আবার খোঁজ শুরু হয়। আবার গুলিয়ে ওঠে কাদা। কিন্তু আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ফিতে খুলে টিনের পাত্রটায় বার করে জল সেচতে শুরু করে লোকটি। প্রথমে উন্মত্তের মতো সেচতে শুরু করার ফলে নিজেও ভিজছিল আর জলটাকে তার বদলে পুকুরের এত কাছে ছুঁড়ছিল যে তা আবার পুকুরেই ফিরে আসছিল। আরো সতর্কভাবে কাজ করছে ও এখন। হৃদপিণ্ডটা যদিও বুকের ওপর ধক্ ধক করে আঘাত করছে, হাত কাঁপছে, তবুও মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে চেষ্টা করে। আধঘণ্টা পর জলের কূপটা প্রায় শুকিয়ে আসে, এক কাপের মতো জলও নেই। কিন্তু কোথায় মাছ। তার বদলে পুকুরের তলাকার পাথরের মধ্যে ছোট্ট একটা ফোকর দেখতে পায়। নিশ্চয় ওটা ফোকর গলে পাশের বড় পুকুরটায় সটকেছে। এ পুকুরটাকে সারাদিন সারারাত ধরে সেচলেও জলশূন্য করতে পারবে না। ফোকর রয়েছে জানলে প্রথমেই ওটার মুখটা একটা পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিতে পারত, মাছটা তাহলে হাতে এসে যেত।

কথাটা ভাবতে ভাবতে কুঁকড়ে গিয়ে ভিজে মাটির ওপরই লুটিয়ে পড়ে লোকটি। প্রথমে নিজের মনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। তারপর চারদিক থেকে ঘিরে ধরা অকরুণ নির্জনতাকে শুনিয়ে সরবে কাঁদতে শুরু করল। বহুক্ষণ ধরে শুকনো চাপা কান্নায় ওর দেহটা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

এবার আগুন জ্বালিয়েছে লোকটি। খানিকটা গরম জল খেয়ে ঠাণ্ডাও কাটিয়েছে। গত রাতের মতোই একটা চোখা পাথরের ওপর ওর আজকের আস্তানা। ঘুমোবার আগে দেশলাইয়ের কাঠিগুলোর শুষ্কতা পরখ করে ঘড়িতে দম দিয়ে নেয়। কম্বলটা ভিজে আর চটচটে। গোড়ালিটাও যন্ত্রণায় দপদপ করছে। কিন্তু ও কেবল একটা কথাই বোঝে : আমি এখন ক্ষুধার্ত। ঘুমের মধ্যে ভোজসভার স্বপ্ন দ্যাখে, দ্যাখে সবরকম খাদ্যদ্রব্যের পরিপাটি পরিবেশন।

ঘুম ভেঙে লোকটি দেখল তার ঠাণ্ডা লেগে গেছে। অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করে। সূর্য বলে কিছু নেই। পৃথিবী ও আকাশের ধূসরতা আরো ঘনীভূত হয়েছে—আরো ভীতিপ্রদ। বাতাস হিম শীতল। তুষারকণাপূর্ণ দমকা হাওয়া পাহাড়ের চূড়োগুলোকে শুভ্রতায় ঢেকে দিয়েছে। আগুন জ্বেলে আরো খানিকটা জল গরম করার সময় বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। আধো বৃষ্টিপাতের মতো তুষারপাত হতে শুরু করে। তুষারকণাগুলো আকারে বেশ বড়। অবিরাম তুষারপাত চলতে থাকে। জমি ঢাকা পড়ে যায়। মাটির সংস্পর্শে এসে তুষারকণাগুলো গলে যাচ্ছে তাই জ্বালানো শেওলাগুলো ভিজে গিয়ে আগুনটা নিভে গেল।

আর বসে থাকার উপায় নেই। বোঁচকাটা কাঁধে এঁটে আবার এগিয়ে চলল লোকটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। কোথায় যে যাবে তা অবশ্য সে জানে না। ক্ষুদ্র কঞ্চির দেশ, কি বিল, কি ডিজে নদীর তীরে উপুড় করা নৌকো—কোনোটার জন্যেই ওর মাথাব্যথা নেই। এখন কেবল একটি ধাতুপদ ওর ওপর প্রভুত্ব করছে : খাওয়া। লোকটি ক্ষুধা-পাগল। কোন পথ ধরে এগোচ্ছে সেদিকেও খেয়াল নেই। কোনোমতে এই শেওলাময় নিম্নভূমি পার হতে পারলেই খুশি। ভিজে তুষার আর জেলো মাসকেগ বেরি এড়িয়ে নলখাগড়া ওপড়াতে ওপড়াতে আন্দাজে পা ফেলে এগোয় লোকটি। বস্তুটি স্বাদহীন, তৃপ্তি পায় না একেবারে। একটা আগাছার সন্ধান পেয়েছে এবার—ঝাল ঝাল খেতে। যখনই চোখে পড়ছে খাচ্ছে কিন্তু বেশি চোখে পড়ছে না। আগাছাগুলো লতা গাছের মতো তাই কয়েক ইঞ্চি তুষার জমলেই চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে।

রাত্রে আর আগুন জ্বালাতে পারা যায় না, গরম জলও জোটে নি একফোঁটা। কোনো উপায় না দেখে ঘুমের আয়োজন করতে কম্বলের তলায় ঢুকে পড়ে কোনো রকমে। তুষারপাতের বদলে হিম শীতল বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে এখন। অনেকবার ঘুম ভেঙে টের পেয়েছে। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকার দরুন মুখের ওপর বৃষ্টি এসে পড়ছে।

সকাল হল। ধূসর, সূর্যহীন প্রভাত। বৃষ্টি থেমে গেছে। ক্ষুধার তীব্রতাটাও নেই। খাদ্যসংক্রান্ত সমস্ত অনুভূতি নির্মূলভাবে লোপ পেয়েছে। পেটের মধ্যে একটা ভোঁতা যন্ত্রণা আর ভারী ভারী ভাব, তবে এমন একটা কিছু বিরক্তিকর নয়। এখন ও আগের চেয়ে অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গতভাবে চিন্তা করছে, ফলত আগের মতোই কঞ্চির দেশ আর ডিজে নদীর তীরে উপুড় করা নৌকোটাই বর্তমানে ওকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করছে।

একটা কম্বলের অবশিষ্টাংশটুকু পায়ে বেঁধে নেয় লোকটি। আঘাত লাগা গোড়ালিটাতে জড়ানো ফেট্টিটা আরেকবার ঠিক করে। আরেকদিনের পথ পরিক্রমার জন্যে তৈরি হতে থাকে। বোঁচকাটার কাছে এসে বেশ খানিকক্ষণ ভাবে হরিণের চামড়ার পেটমোটা থলিটাকে নিয়ে কী করবে। শেষ পর্যন্ত ওটাকে তুলেই নেয়।

বৃষ্টির দরুণ তুষার গলে গেছে, শুধু পর্বতশিখরগুলো এখনো সাদা দেখাচ্ছে। সূর্য উঠেছে বলে এখন এই দিক-যন্ত্রের সাহায্যেই ও দিক নিরূপণে সক্ষম হচ্ছে। অবশ্য এ কথা তার অজানা নয় যে ইতিমধ্যেই সে পথ হারিয়েছে। হয়ত গত কদিনের যাত্রাকালে বেশি মাত্রায় বাঁ দিকে সরে এসেছে। তাই বিচ্যুতিটা শুধরে নিতে ডান দিক চেপে চলতে শুরু করে লোকটি।

খিদের চোটে পেটের মোচড় আগের মতো অসহনীয় ঠেকছে না বটে কিন্তু বুঝতে পারে সে ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। ঘন ঘন বিশ্রাম নিতে বাধ্য হচ্ছে। এই সময়টুকুতে মাসকেগ বেরি এবং নলখাগড়াদের আক্রমণ করার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে ওঠে। জিভটাকে বেশ শুকনো আর আকারে বড় ঠেকে—জিভের ওপর যেন রোঁয়া গজিয়েছে। স্বাদটা কটু মনে হয়।

হৃৎপিণ্ডটা ওকে বেশ কষ্ট দিচ্ছে। কয়েক মিনিট হাঁটতে না হাঁটতে বুকের ভিতরটা জোরে জোরে আন্দোলিত হতে থাকে। হঠাৎ যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। মাথাটা ঘুরতে শুরু করে, জ্ঞান হারাবার উপক্রম হয়।

দুপুর নাগাদ একটা বড় পুকুরে দুটো মিনোর সাক্ষাৎ মিলল। এত জল ছেঁচে ফেলা অসম্ভব। মাথাটা এখন ওর বেশ ঠাণ্ডাই আছে। তাই চটপট টিনের পাত্রটার সাহায্যেই মাছ দুটোকে ধরে ফেলল। মাছ দুটো আঙুলের চেয়ে বড় হবে না, কিন্তু তাতে কী? ওর তো আর এখন তেমন ক্ষিদে নেই। পেটের মধ্যেকার ভোঁতা যন্ত্রণাটা আরো কম অনুভব করছে। খিদের সময় না খেতে পেয়ে পেটটা ঘুমিয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। তবু কাঁচা মাছটা চিবিয়ে চিবিয়ে খায়। খাওয়ার জন্যেই খাওয়া। বাঁচার প্রয়োজনেই খেতে হবে।

বিকেলে আরো তিনটে মিনো ধরতে পেরেছে। দুটো খেয়ে একটা রেখে দিয়েছে প্রাতরাশের জন্যে। ইতস্তত গজানো শেওলার চাপড়াগুলো সূর্যকিরণে শুকিয়ে গেছে। জল গরম করে খানিকটা ঠাণ্ডা দূর করার সুযোগ পায় ও। আজ দশ মাইলের বেশি হাঁটতে ও পারে নি। প্রতিকূল অবস্থাকে কাটিয়ে পরদিন সেটা পাঁচ মাইলে এসে ঠেকল। খিদের জন্যে আর বিন্দুমাত্র অস্বস্তি বোধ করছে না। পেটটা ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন ও একটা অচেনা অঞ্চল পাড়ি দিচ্ছে। প্রচুর সংখ্যক নেকড়ে আর বলগা-হরিণের দেখা মেলে এখানে। নির্জন প্রান্তর পেরিয়ে ঘন ঘন তাদের ডাক কানে আসছে। আর একটি রাত পেরোল। হরিণের চামড়ার পেটমোটা থলিটা উল্টোতেই তার মুখ দিয়ে অপরিশুদ্ধ সোনা আর সোনার তাল হলুদ স্রোতের মতো বেরিয়ে আসে। সোনাটা মোটামুটি দুটো সমান ভাগে ভাগ করে এক ভাগ কম্বলের টুকরোয় মুড়ে বিচিত্র ধরনের একটা পাথরের চাঁইয়ের তলায় রেখে দেয় আর অন্য ভাগটিকে বোঁচকায় পুরে নেয়। তারপর শেষ কম্বলটি থেকে একটা ফালি ছিঁড়ে পায়ে জড়ায়। বন্দুকটা যে এখনো ত্যাগ করেনি তার কারণ ভিজে নদীর ধারে বোঁচকাটার মধ্যে টোটা আছে।

দিনটা কুয়াশাচ্ছন্ন। আজ আবার খিদেটা চাগিয়েছে। অত্যন্ত দুর্বল বোধ করে। মাথাটা এমন ভাবে ঘুরছে যে সময় সময় চোখে অন্ধকার দেখে। অবস্থা যা তাতে মাথা ঘুরে আছাড় খাওয়াও এমন কিছু অসম্ভব নয়। হঠাৎ মাথা ঘুরে একটা মুরগির বাসার ওপর গিয়ে পড়ে লোকটি। দিন খানেক হবে ডিম ফুটে চারটে ছানা বেরিয়েছিল বোধহয়। এক এক কণা স্পন্দিত জীবন। এক গ্রাসে সব কটাকে খেয়ে ফেলা যায়। খোলা শুদ্ধ ডিম চিবানোর মতো জ্যান্ত বাচ্চাগুলোকে মুখে পুরে চিবাতে শুরু করে। মা-মুরগিটা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ওর চারপাশে ঘুরে ঘুরে ডানা ঝাপটায়। বন্দুকটাকে গদার মতো বাগিয়ে ধরে মা-মুরগিটাকে মারতে চায় কিন্তু পারে না। ঠিক পাশ কাটিয়ে সরে পড়ছে বার বার। বন্দুক দিয়ে মারতে না পেরে শেষ পর্যন্ত পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। হঠাৎ একটা নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে মুরগিটার একটা ডানা ভেঙে যায়। মুরগিটা ভাঙা ডানাটা টেনে টেনে ছুটতে শুরু করে আর লোকটি তার পিছু ধাওয়া করে।

মুরগির ছানাগুলো সাময়িকভাবে ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটিয়েছে। আহত গোড়ালিটার ওপর কোনো রকমে ঠেক রেখে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোয় লোকটি। পাথর ছোঁড়ে আর কর্কশ কণ্ঠে চেঁচায়। আবার কখনো বা নিঃশব্দে এগিয়ে চলে। মাটিতে পড়ে গেলে ধীরে সুস্থে উঠে বিমর্ষ দৃষ্টিতে তাকায়। মাথা ঘোরার উপক্রম হলে তা কাটিয়ে ওঠার জন্যে চোখ রগড়ায়।

ডানা ভাঙা মুরগিটার পিছু ধাওয়া করতে করতে লোকটি উপত্যকার নিম্নবর্তী জলাভূমিতে এসে পৌঁছায়। ভিজে শেওলাগুলোর ওপর চোখ পড়তেই দ্যাখে কার যেন

পায়ের ছাপ। এ পায়ের ছাপ কোনোমতেই তার হতে পারে না। তাহলে বিলের নিশ্চয়। কিন্তু এখন থামা চলে না। আগে ছুটন্ত মুরগিটাকে ধরতে হবে। তারপর ফিরে এসে অনুসন্ধান।

এক নাগাড়ে ছুটিয়ে ছুটিয়ে মুরগিটাকে নির্জীব করে দিয়েছে। কাত হয়ে শুয়ে ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে মুরগিটা। লোকটিরও দম ফুরিয়ে এসেছে। ঠিক মুরগিটার মতো কাত হয়ে শুয়ে লোকটি হাঁস ফাঁস করতে লাগল। মুরগিটার সঙ্গে ওর ব্যবধান মাত্র কয়েক ফুটের। কিন্তু হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ওটাকে ধরবে যে, সে-শক্তিও ও হারিয়েছে। লোকটি যতক্ষণে দম ফিরে পেয়ে মুরগিটার দিকে এগোল ততক্ষণে মুরগিটাও দম ফিরে পেয়েছে। লোকটির হাত পৌঁছানোর আগেই মুরগিটা সরে পড়ল। আবার শুরু হল পেছনে ছোটা। দেখতে দেখতে রাত নেমে আসে। সুযোগ বুঝে মুরগিটা অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। অত্যন্ত দুর্বল শরীর। হোঁচট খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে লোকটি সোজা আছড়ে পড়ল মাটিতে। মুখে জোর আঘাত লাগে; চিবুকটা কেটে যায়। পিঠের ওপর বোঁচকাটা যেমন বাঁধা ছিল তেমনই আছে। বেশ খানিকক্ষণ লোকটি নড়াচড়া করে না। তারপর পাশ ফিরে শোয়। ঘড়িতে দম দিয়ে ওই ভাবেই শুয়ে কাটিয়ে দেয় সকাল পর্যন্ত।

দিনটা আজও কুয়াশাচ্ছন্ন। শেষ কম্বলের অর্ধেকটা চলে গেছে পায়ে ফেট্টি বাঁধার কাজে। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। খিদের প্রচণ্ড তাড়নাতেই ও এখন এগিয়ে চলেছে। আচ্ছন্নভাবে পথ চলতে চলতে ভাবে-বিলও কি পথ হারিয়েছে? দুপুর নাগাদ বোঁচকাটার বোঝা অসহ্য মনে হয়। যেটুকু সোনা ছিল ফের তা দুভাগে ভাগ করে। অর্ধেকটা এবার সোজাসুজি মাটিতে ছড়িয়ে দেয় তারপর একটু ভেবে বাকি অর্ধেকটাও ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সঙ্গে এখন কেবল আধখানা কম্বল, টিনের পাত্র আর বন্দুক।

একটা মায়াকল্পনা ওর অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবার। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে যে এখনো একটা টোটা আছে—বন্দুকেই পোরা আছে! আগেরবার দেখার সময় ঠিক চোখ এড়িয়ে গেছে। অথচ ও জানে, বন্দুকের ভিতর আদৌ কিছু নেই। তবু এই মায়াকল্পনার হাত থেকে রেহাই মেলে না। এক অলীক কল্পনার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ লড়াই চালাবার পর বন্দুকটাকে ও মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বন্দুকটা খুলে দ্যাখে যথারীতি ওটার মধ্যে কিছু নেই। হতাশার তিক্ততা এত তীব্র যে মনে হয় যেন সত্যিই টোটাটা ও দেখবে বলে আশা করেছিল।

আধঘণ্টা ধরে খুব কষ্টকরভাবে চলার পর আবার মায়া কল্পনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে লোকটি। খুব চেষ্টা করে আজগুবি ভাবনার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার, কিন্তু রেহাই পায় না। শেষ পর্যন্ত কোনো উপায় না দেখে এই আজগুবি ভাবনা আর সন্দেহের নিরসন ঘটাতে বন্দুকটাকে আবার খুলে ফেলে। নানা চিন্তায় ডুবে গিয়ে যন্ত্রচালিতের মতো পথ হেঁটে চলেছে। আত্মপ্রতারণার এই উদ্ভট চিন্তা কীটের মতো ওর মস্তিষ্ককে দংশাতে থাকে। কিন্তু বাস্তবকে উপেক্ষা করে এই সুখ-ভ্রমণের স্থায়িত্ব খুব অল্পক্ষণের, কারণ খিদের তীব্র জ্বালা অনবরত ওকে পিছনের ভাবনায় ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সুখ-চিন্তায় আচ্ছন্নের মতো চলতে চলতেই হঠাৎ ওর সম্বিৎ ফিরে আসে। চোখের সামনে যা দেখেছে আর একটু হলেই মূর্ছিত হয়ে পড়ত। দেহটা টলমল করে ওঠে, মাতালের মতো এধার সেধার এলোমেলো পা ফেলে পতনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচায়। সামনেই একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে। ঘোড়া-একটা ঘোড়া! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। ঘন কুয়াশায় চোখ দুটো ঢেকে গেছে, তার মধ্যে বিন্দু বিন্দু আলোক কণা। পাগলের মতো চোখ ঘষে

পরিষ্কার করতে চায়। দ্যাখে, কোথায় ঘোড়া।—খয়েরি রঙা বিশাল এক ভাল্লুক। উৎসুক যোদ্ধার মতো ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

বন্দুকটাকে প্রায় কাঁধ বরাবর তোলার পর, ছোরাটার কথা খেয়াল হল। বন্দুকটা তক্ষুনি নামিয়ে রেখে পুঁতি বসানো খাপ থেকে টেনে বার করল ছোরাটাকে। সামনেই রয়েছে খাদ্য ও জীবন ! বুড়ো আঙুলটা ছোরার কানার ওপর একবার বুলিয়ে নেয়। অত্যন্ত ধারালোভাবে এক নিমেষে ভাল্লুকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। কিন্তু বুকের ভিতর থেকে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়-দপ্ দপ্ দপ্। বুকের ভিতরটা হাঁক পাঁক করছে, একটা লোহার সাঁড়াশি দিয়ে কে যেন কপালটা টিপে ধরেছে। ধীরে ধীরে মাথা ঘোরার ভাবটাও বেড়ে চলে।

কিছুক্ষণ আগের বেপরোয়া ভাবটা কোথায় উবে গেছে। একটা অজানা আতঙ্ক ওকে পেয়ে বসে। ওর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জন্তুটা ওকে যদি আক্রমণ করে তখন উপায়? যতখানি সম্ভব শরীরটাকে টান টান করে নির্ভীকভাবে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। মুঠোর মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরে ছোরাখানা। হিংস্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ভাল্লুকটার দিকে। ভাল্লুকটা থপ্ থপ্ করে দুচার পা এগিয়ে আসে, গুঁড়ি মেরে বসে একটা গর্জন ছাড়ে। যেন দেখতে চায় লোকটা বুঝতে পারবে কিনা। লোকটি যদি ছোটে তাহলে ভাল্লুকটাও ছুটবে। ভয় ভাবনা সব কিছুকে উপেক্ষা করে লোকটি মরিয়া হয়ে হয়ে গর্জন করে উঠল। বুনো জন্তুর মতো, প্রচণ্ডরকম। যে ভীতি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, প্রাণের গভীরতম বোধই যার উৎস, এ গর্জনে তাইর অনুরণন।

ভাল্লুকটা গর গর করতে করতে একপাশে সরে যায়। রহস্যময় অবিচল এই মানুষটিকে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভাল্লুকটাও বিস্মিত। লোকটি একটুও নড়ে নি। যতক্ষণ না বিপদ অতিক্রান্ত হয় ততক্ষণ প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আতঙ্কগ্রস্ত মানুষটি সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভিজে শেওলার ওপর লুটিয়ে পড়ে।

এতক্ষণে লোকটি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভয় কাটিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করেছে। এবার আর এক নতুন ভীতি ওকে পেয়ে বসে। খাদ্যের অভাবে ধীর মৃত্যুর বিভীষিকা নয়। ভয়টা এই যে অনাহারে মৃত্যুর আগেই, বাঁচার এই লড়াইয়ে উদ্যমের যে শেষ স্ফুলিঙ্গটুকু ওকে এখনো অগ্রসর হবার তাগিদ জোগাচ্ছে, তা নির্বাপিত হবার আগেই, ওকে হয়ত কোনো হিংস্র প্রাণীর শিকার হতে হবে। নেকড়েদের কথা কি ভোলা যায় ! নির্জন প্রান্তরের এধার ওধার থেকে ওদের গর্জন ভেসে আসছে। নিস্তব্ধতার ঠাস বুনুনীকে ফালা ফালা করে গর্জন ছড়িয়ে পড়ছে। প্রচণ্ড ঝড়ে ফুলে ওঠা তাঁবুর মতো ভয়ঙ্কর এই গর্জনকে ঠেকাবে বলেই যেন নিজের অজান্তেই লোকটি কখন দুহাত শূন্যে মেলে ধরে।

মাঝে মাঝে দুটো বা তিনটে করে এক একটা নেকড়ের দল ওর সামনে দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে পথ পার হচ্ছে। অবশ্য দলে খুব ভারী নয় বলে কাছে ঘেঁষতে সাহস পাচ্ছে না। তাছাড়া ওদের লক্ষ্য এখন বলগা হরিণদের দিকে। বলগা হরিণরা যখন বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করে তখন কী দরকার এই বিচিত্র দর্শন জীবটার কাছে ঘেঁষার। বলা তো যায় না, মাথা খাড়া করে যেভাবে হাঁটছে, তাতে আঁচড়ে কামড়ে দিলেও দিতে পারে।

বিকেল নাগাদ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু হাড়গোড় চোখে পড়ল লোকটির। আধঘণ্টাখানেক আগে একটা বলগা হরিণের বাচ্চা নেকড়েদের শিকার হয়েছে। মাংসহীন চকচকে হাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে লোকটি ভাবে, একটু আগেও হরিণ-শিশুটি কর্কশ চিৎকারে

চারিদিক মাতিয়ে তুলেছিল নিশ্চয়। প্রাণবন্ত চপল হরিণ শিশুটি এখন কতকগুলো মাংসহীন হাড়ের সমষ্টি মাত্র। তবু ওর মনে হয় ওই হাড়ের ভিতরকার জীবকোষে এখনো যেন প্রাণের স্পন্দন রয়েছে, বেশ লালচে দেখাচ্ছে। এমনও তো হতে পারে, দিন ফুরোবার আগে ওরও এই একই দশা হবে। এই তো জীবন, তাই না? অসার, সদা অপসৃয়মাণ। একমাত্র জীবনই যন্ত্রণাদায়ক, মৃত্যুর মধ্যে কোনো যন্ত্রণা নেই। মরা মানেই ঘুমোনো। মানে বিরাম, অনন্ত বিশ্রাম। কিন্তু তাই যদি হবে তাহলে ও কেন মৃত্যুবরণের চিন্তায় খুশি হতে পারছে না?

বেশিক্ষণ এসব নীতি কথা নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল। ঘাসের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে মুখে একটা হাড় পোরে। প্রাণের ক্ষীণ অবশিষ্টাংশ থাকার দরুন হাড়ের ভিতরটা এখনো লাল দেখাচ্ছে। মিষ্টি মাংসের স্বাদ এতে এত কম যে সত্যি মাংস খাচ্ছে না কল্পনায় তা উপলব্ধি করছে বোঝা দুষ্কর। তবে এটা ঠিক যে স্বাদটা ওকে পাগল করে দিয়েছে। হাড়ের ওপর দুপাটি দাঁত বসিয়ে কচমচ করে চিবাতে শুরু করে। কখনো হাড়টা ভাঙে কখনো ওর দাঁত। শেষ পর্যন্ত হাড়গুলোকে একটা পাথরের ওপর রেখে আর একটা পাথর দিয়ে আঘাত করে। আঘাত করতে করতে মজ্জা সমেত হাড়গুলো একটা তালে পরিণত হলে সেটাকে গিলে নেয়। তাড়াহুড়োয় আঙুলের ওপর বাড়ি পড়ে। অবাক হয়ে দ্যাখে, এত জোরে আঙুলের ওপর আঘাত পড়ার পরও ও তেমন যন্ত্রণা অনুভব করছে না।

ভয়াবহ বৃষ্টি আর তুষারপাত শুরু হয়েছে। এ কদিন কখন কোথায় যে আস্তানা গেড়েছে আর কখনই বা তা গুটিয়ে নিয়েছে, নিজেই তা জানে না। দিনেও যত হেঁটেছে, রাত্তিরেও তত। চলতে চলতে যেখানে পড়ে গিয়েছে সেখানেই শুয়ে বিশ্রাম নিয়েছে। আর যে যে সময় মৃতপ্রায় প্রাণটা নিবন্ত আলোকশিখার মতো দপ্ করে উঠে আরো ম্লান হয়ে গিয়েছে তখন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়েছে। মানুষ হিসেবে ও আর এখন বুঝছে না, বুঝছে ওর মধ্যেকার মরণে অনিচ্ছুক মৃতপ্রায় প্রাণটা। এই প্রাণটাই ওকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। কষ্ট তেমন বোধ হচ্ছে না। স্নায়ুতন্ত্র ভোঁতা ও অসাড় আর মানসপটে শুধু অলৌকিক দৃশ্য ও লোভনীয় স্বপ্নের সমাবেশ।

বলগা হরিণের ছানাটার সামান্য যে অবশিষ্টটুকু পড়েছিল, তাই জড়ো করে সঙ্গে নিয়েছিল লোকটি। পথ চলতে চলতে চূর্ণবিচূর্ণ হাড়গুলোকে ক্রমাগত চুষছে আর চিবুচ্ছে। এর মধ্যে পথে আর কোনো পাহাড় বা জল-বিভাজিকা পেরোতে হয় নি। প্রশস্ত ও অগভীর উপত্যকার মধ্যে দিয়ে একটা বড় নদী বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ লোকটির খেয়াল হয় সে এখন ওই নদীটির তীর ধরেই এগোচ্ছে। কখন যে সে ওই নদীর তীর ধরে এগোতে শুরু করেছে, কখন যে উপত্যকাটা পেরিয়েছে, কিছুই তার স্মরণে নেই। এতক্ষণ সে শুধু কম্পিত দৃশ্য ছাড়া কিছুই দেখতে পায় নি। দেহ ও প্রাণশক্তির বন্ধন সূত্রটি এতই ক্ষীণ যে যদিও এরা পাশাপাশি থেকে হাঁটছে বা হামাগুড়ি দিচ্ছে তবু এদের মধ্যে ব্যবধান মোটেই অল্প নয়।

ঘুম ভাঙার পর প্রথম খেয়াল হল সে একটা চোখা পাথরের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। সূর্যের উজ্জ্বল উষ্ণ আলো চারিদিক ভরিয়ে দিয়েছে। দূর থেকে বলগা হরিণের বাচ্চাগুলোর কুঁই কুঁই শব্দ কানে আসছে। প্রচণ্ড বৃষ্টি আর তুষারপাত কিংবা ঝোড়ো বাতাসের সম্মুখীন হবার আবছা কিছু কিছু কথা মানসপটে ভেসে উঠছে, কিন্তু প্রবল ঝড়ের দাপটে কাবু হয়ে দুদিন শুয়ে কাটিয়েছে, না দু-সপ্তাহ—তা সে জানে না।

খানিকক্ষণ নিশ্চলভাবে শুয়ে থাকে লোকটি। অকৃপণ সূর্যরশ্মি ঝরে পড়ে ওর ওপর,

ভূ ার ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ হিমশীতল শরীরটাকে উষ্ণতায় চাঙ্গা করে তোলে। মনে মনে ও চিন্তা করে দিনটি আজ ভারী সুন্দর, ভারী উজ্জ্বল। এখন সে ঠিক কোথায় আছে, আজই হয়ত তার হদিশ করতে পারবে। নিচ দিয়ে একটা প্রশস্ত ধীরস্রোতা নদী বয়ে যাচ্ছে। অপরিচিত নদীটিকে দেখে ও অবাক হয়। চোখ মেলে জলধারাটিকে অনুসরণ করে। বড় বড় বাঁক নিয়ে বহু নিচু আর নেড়া নেড়া পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ঘুরে ফিরে এগিয়ে গেছে নদীটি। এ পর্যন্ত যে-কটা পাহাড় ও দেখেছে এগুলো আকারে তার চেয়ে ছোট এবং আরো নেড়া। লোকটি এবার নদীর পথরেখা অনসরণ করছে। উত্তেজনাহীন ধীর পদক্ষেপ—আগ্রহ যেটুকু প্রকাশ পায় তা অতি মামুলি ধরনের। উজ্জ্বল এক সাগরে গিয়ে পড়েছে নদীটি। এ দৃশ্যও কিন্তু লোকটিকে উত্তেজিত করতে পারে না। ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার, মনে মনে ভাবে। এটা কাল্পনিক দৃশ্য না মরীচিকা? খুব সম্ভবত কাল্পনিক দৃশ্য, বিশৃঙ্খল মনের একটা চাতুরি। ঝলমলে সমুদ্রের মাঝখানে একটা জাহাজকে নোঙর ফেলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়। মুহূর্তের জন্যে চোখ বন্ধ করে, তারপর আবার খোলে—আশ্চর্য, এখনো দৃশ্যটা মেলায় নি। তবে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে, এতো সবাই জানে যে বন্ধ্যা প্রান্তরের মাঝ মধ্যিখানে সমুদ্র বা জাহাজ থাকতে পারে না। যেমন জানত—বন্দুকে টোটা নেই—

পিছনে একটা ঘড় ঘড় শব্দ শোনে—কতকটা হাঁপ ওঠার মতো। শারীরিক দুর্বলতার জন্যে খুব আস্তে আস্তে পাশ ফেরে। কাছাকাছির মধ্যে কিছুই নজরে পড়ে না। তবু ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করে যদি কিছু দেখতে পায়। আবার ঘড় ঘড় শব্দ কানে আসে। বোধ হয় কুড়িফুট দূরও হবে না, এবড়ো খেবড়ো দুটো পাথরের মধ্যে একটা নেকড়ের ধূসর মুখখানা চোখে পড়ে। নেকড়েটার কানগুলো তেমন ছুঁচোলো নয়। তাছাড়া চোখ দুটো ঘষা-ঘষা রক্তবর্ণের। মাথাটা অসহায়ের মতো ঝুলে রয়েছে। জন্তুটা সূর্যালোকে ক্রমাগত চোখ পিট পিট করে তাকাচ্ছে। অসুস্থ বলেই মনে হয়। জন্তুটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই ফের ওটার হাঁপ ওঠে, কাশে। এখন ও যা দেখছে সেটা যে অলীক কিছু নয়, তা ও নিশ্চিতভাবে বুঝেছে। উল্টো দিকে চোখ ফিরিয়ে একবার বাস্তব জগতটাকে ভালো করে দেখে নেয়। এতক্ষণ এই বাস্তব জগতটাই কাল্পনিক দৃশ্যের আড়ালে ঢাকা পড়েছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য। দূরে সমুদ্রটা এখনো ঝকমক করছে, জাহাজটাও পরিস্কার চোখে পড়ছে। তাহলে যা দেখছে সত্যি? চোখ বুজে বেশ খানিকক্ষণ চিন্তা করার পর ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হয়। ডিঙ্গে জল বিভাজিকা দূরে রেখে এতদিন ও উত্তর পূর্ব দিকে এগিয়েছে—অর্থাৎ কপার মাইন উপত্যকার দিকে। এই প্রশস্ত ধীরস্রোতা নদীটি তাহলে কপার মাইন নদী। আর ওই উজ্জ্বল সাগরটি তবে সুমেরু সাগর। জাহাজটা নিশ্চয় তিমি শিকারের, ম্যাকেঞ্জি নদীর মুখ থেকে পূর্ব দিকে, অনেকটা পূর্বদিকে সরে এসে করোনেশান ফাঁড়িতে নোঙর ফেলছে। বহুদিন আগে দেকা হাডসনস বে কোম্পানির চার্টের কথা মনে পড়ে, এ ব্যাপারে আর কোনো দ্বিধা নেই। নিজের সিদ্ধান্তটা যুক্তিমাফিক বলেই মনে হয়।

উঠে বসে প্রয়োজনমাফিক জিনিসপত্র গোছানোর দিকে মনোনিবেশ করে। কম্বলের ফেট্টি দুটো ছিড়ে গেছে, পা দুটো আকারবিহীন কাঁচা মাংসের তালে পরিণত হয়েছে। শেষ কম্বলটাও গত। বন্দুক ও ছোরা দুটোই হারিয়েছে। তাছাড়া টুপিটা পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেশলাই কাঠিগুলোও লোপাট। তামাকের থলিতে তেলা কাগজ মোড়া দেশলাই কাঠিগুলো বুকের মধ্যে ঠিকই আছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দ্যাখে এগারোটা বেজেছে। ঘড়িটা এখনো চলছে। বোঝাই যাচ্ছে সময়মতো দম দিতে ভুল হয় নি।

লোকটি এখন শান্ত, সুস্থির। অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু কোন যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি নেই। ক্ষুধার্তও নয়। খাদ্যের চিন্তা আগের মতো আর ওর মনকে প্রলুব্ধ করছে না। যুক্তিহীন এলোমেলো চিন্তা আর ওকে কাবু করতে পারছে না। প্যান্টের তলার দিকে দুটো হাঁটুর কাছ থেকে কাপড় ছিড়ে নিয়ে পায়ে জড়িয়ে নেয়। যে করেই হোক টিনের পাত্রটা কাছছাড়া হয় নি। জাহাজ অভিমুখে যাত্রা শুরু করার আগে, খানিকটা গরম জল খেয়ে নেয় লোকটি, কারণ ও অনুমান করতে পারে এ যাত্রা হবে অত্যন্ত কষ্টকর এবং ভয়াবহ।

অত্যন্ত ধীরে মন্থর গতিতে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো কাঁপতে কাঁপতে এগোতে থাকে। মাঝখানে একবার শুকনো শেওলা সংগ্রহ শুরু করার পর দ্যাখে যে আর উঠে দাঁড়ানোর শক্তি নেই। বার বার চেষ্টা করেও উঠে দাঁড়াতে পারে না। শেষ পর্যন্ত চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়েই এগোতে থাকে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে এগোতে এক সময় নেকড়েটার কাছে গিয়ে পড়ে। অনিচ্ছুকভাবে জন্তুটা ওর পথ থেকে সরে আসে। জিভ দিয়ে থাবাগুলো চাটতে শুরু করে। দেখে মনে হয় এমন শক্তিও নেই যে জিভটাকে মুড়বে। লোকটি লক্ষ্য করে যে নেকড়ের জিভটা সুস্থ স্বাভাবিক লাল রঙা নয়, হলদে খয়েরির মিশ্রণ, রুক্ষ গোছের—আধ শুকনো শ্লেষ্মায় ঢাকা।

দু-পাঁইটের মতো গরম জল খাবার পর লোকটি দেখল ও দাঁড়াতে পারছে, হাঁটতেও পারছে, যদিও সেই চলার পায়ে পায়ে মৃত্যু পথযাত্রীর শিথিলতা। মিনিটে মিনিটে দাঁড়িয়ে পড়ে বিশ্রাম নিতে হয়। পিছু পিছু নেকড়েটাও আসছে। ওর মতো নেকড়েটারও প্রতিটি পদক্ষেপ দুর্বল এবং অনিশ্চিত। রাত্রি নামে, অন্ধকারে ডুবে যায় ঝলমলে সমুদ্রটা। বুঝতে পারে সমুদ্রের দিকে চার মাইলের বেশি এগোতে পারে নি।

সারারাত ধরে কানে আসে অসুস্থ নেকড়েটার দম বন্ধ করা কাশির শব্দ আর বলগা হরিণের ছানাদের কুঁই কুঁই ডাক। লোকটির চারধার ঘিরে জীবনের ছড়াছড়ি, তবে তা বড় কঠিন জীবন-অতি সজীব, অতি সুস্থ। আর এই জন্যেই ও অসুস্থ মানুষটার পিছু ছাড়ছে না কিছুতে। কারণ নেকড়েটার অনুভূতি ওকে বলে দিচ্ছে মানুষটাই আগে মরবে—আর তখন....

সকালে চোখ মেলতেই দ্যাখে নেকড়েটা সতৃষ্ণ ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে ওকে পর্যবেক্ষণ করছে। গুড়িসুড়ি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। মরণাপন্ন ঘেয়ো কুকুরের মতো লেজটা দুপায়ের মধ্যে ঢুকে আছে।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় অসুস্থ নেকড়েটা কাঁপছে। লোকটি নেকড়েটাকে উদ্দেশ্য করে কী যেন বলে কিন্তু গলার কর্কশ স্বর ফিসফিসানির ওপরে ওঠে না। নেকড়েটা নিরুৎসাহী ভাবে দাঁত খিচোয়।

উজ্জ্বল সূর্যের দেখা মিলেছে এবার সারা সকাল ধরে টলমলে পায়ে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলে—লক্ষ্য তার তিমি ধরা জাহাজটি। এগোতে এগোতে বারবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে। পরিষ্কার আবহাওয়া। এই উচ্চ অক্ষাংশ সুলভ ক্ষণস্থায়ী গ্রীষ্মকালের স্থায়িত্ব এক সপ্তাহে হতে পারে আবার কাল কিংবা তার পরের দিনও এর মেয়াদ ফুরাতে পারে।

বিকেল নাগাদ লোকটি চলার পথে আরেকজন মানুষের পায়ের ছাপ দেখতে পেল। বোঝা যাচ্ছে লোকটি চার হাত পায়ে হাবাগুড়ি দিয়েছে। বিলও হতে পারে বলে ওর মনে হয়। মনে হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু কোনো উত্তেজনা প্রকাশ পায় না। কোনো আগ্রহই নেই। বস্তুত ওর আব এখন আবেগ অনুভূতি বলে কিছু নেই। শারীরিক যন্ত্রণা অবধি টের পাচ্ছে

না। পেট এবং স্নায়ুসমূহের নিদ্রামগ্ন অবস্থা, তবু দেহের অন্তবর্তী জীবনটুকু ওকে এখনো চালিত করছে। মরণের সঙ্গে যুঝে চলেছে। মরতে ও কিছুতেই রাজি নয় বলেই এখনো বিস্বাদ মাসকেগ বেরি এবং 'মিনো' খাচ্ছে, গরম জলটুকু নিয়মিত পান করছে। সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখছে অসুস্থ নেকড়েটার ওপর, যদি আক্রমণ করে বসে!

চার হাত পায়ে আগুয়ান মানুষটির পদচিহ্ন অনুসরণ করে শিগগিরই ও অপরিচিত যাত্রাপথের শেষ প্রান্তে এসে পৌছায়—কতকগুলো হাড় চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। মনে হয় অল্পক্ষণ আগেই ভোজন পর্বটি সমাধা করা হয়েছে। ভিজে শেওলার ওপর বহু নেকড়ের পায়ের থাবার দাগ। হঠাৎ দেখে ওর হরিণের চামড়ার থলির জোড়াটা পথের মধ্যে পড়ে রয়েছে। তীক্ষ্ণ দাঁতের আক্রমণে ছিন্নভিন্ন। লোকটির দুর্বল আঙুলের ক্ষমতা অনুযায়ী চামড়ার থলিটার ওজন খুব বেশি হওয়া সত্ত্বেও ওটাকে তুলে ধরে। বিল এটাকে শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে রেখেছিল। হাঃ-হাঃ! বিলকে দেখিয়ে দেবে, ওস্তাদের মার শেষ রাতে। ও ঠিক বেঁচে যাবে আর এটাকেও ঠিক বয়ে নিয়ে যাবে ঝলমলে সমুদ্রের বুকে নোঙর ফেলা জাহাজটায়। দাঁড়কাকের ডাকের মতোই লোকটির আনন্দের বীভৎস, কর্কশ প্রকাশ। নেকড়েটাও ওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বিষাদক্লিষ্ট ভাবে গর গর করে। আচমকা লোকটি থমকে দাঁড়ায়—এই লালচে-পানা চাঁচাছোলা সাদা হাড়গুলোকে যদি বিল বলতে হয় তাহলে কী করে ওকে মজাটা টের পাওয়াবে? ঘুরে দাঁড়ায় লোকটি। দুর্বল পায়ে এগোতে এগোতে ভাবে—বিল ওকে পরিত্যাগ করেছিল বটে, কিন্তু বিলের সোনা ও নেবে না, আর হাড়গুলো মুখে পুরে চুষবেও না। অবশ্য ওর জায়গায় বিল থাকলে এমন সুযোগ কিছুতেই ছাড়ত না।

এগোতে এগোতে একটা পুকুরের কাছে এসে পৌছায় লোকটি। মিনোর খোঁজে ঝুঁকে দেখতে গিয়ে এক ঝটকায় মাথাটা সরিয়ে নেয়। জলে নিজের মুখের প্রতিফলন দেখে ভয়ে আঁতকে উঠেছে। ভয়ানক বীভৎস সে মুখ। সব কিছু অন্ধকার দ্যাখে। বেশ কিছুক্ষণ পরে অচৈতন্য ভাবটা কাটে। জল সেচা সম্ভব নয়, কারণ পুকুরটা যথেষ্ট বড়। টিনের পাত্রটা নিয়ে কয়েকবার মাছ ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে, তারপর আশা ছেড়ে দেয়। ভয় পায়, প্রচণ্ড দুর্বলতাবশত হয়তো পড়ে যেতে পারে, ডুবে যাওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। একই কারণে বালির চরে আটকেপড়া কোন কাঠের গুঁড়ি চড়ে ও নদী পেরোতে সাহস পায় নি।

জাহাজ আর লোকটির মধ্যেকার ব্যবধান আজ তিন মাইল কমেছে। পরের দিন হয়ত দুই মাইল হবে—কারণ ও এখন বিলের মতো হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। এই ভাবেই পঞ্চম দিনটি পেরোল, এখনো জাহাজ থেকে ওর দূরত্ব সাত মাইল। দিনে এক মাইল পথও পেরোতে পারছে না। ক্ষণস্থায়ী গ্রাম্ম এখনও বিদায় নেয় নি। আবার লোকটি হামাগুড়ি দিতে শুরু করে। মাঝে মাঝে জ্ঞান হারায়, জ্ঞান ফিরলে আবার হামাগুড়ি দেয়। অসুস্থ নেকড়েটা ওর পায়ে পায়ে যেন জড়িয়ে রয়েছে। কাশছে, হাঁপাচ্ছে আর অনুসরণ করছে। জামার পিছনের অংশ ছিড়ে নিয়ে হাঁটুর তলায় প্যাডের মতো জড়িয়ে নেওয়া সত্ত্বেও পা দুটোর মতো হাঁটু দুটোও দগদগে কাঁচা মাংসে পরিণত হয়েছে। পথের শেওলা আর পাথরের ওপর রক্তের চিহ্ন আঁকতে আঁকতে লোকটি এগিয়ে চলে। হঠাৎ একবার পেছন ফিরতেই চোখে পড়ে ক্ষুধার্ত নেকড়েটা সেই রক্তচিহ্নগুলো জিভ দিয়ে চেটে পরিষ্কার করে দিচ্ছে। বুঝতে আর ওর বাকি থাকে না, এখনই যদি ওটাকে খতম করতে না পারে তাহলে অন্তিম পরিণতি কী হবে। এরপরই শুরু হয়ে যায় অস্তিত্বের লড়াইয়ের এক মর্মস্পর্শী নাটক। যার জুড়ি মেলা ভার। জীবনসংগ্রামে বিপর্যস্ত একটি অসুস্থ লোক হামাগুড়ি দিচ্ছে,

হিংস্র আক্রোশে ফুঁসছে আর অন্যদিকে এক ক্ষুধার্ত অসুস্থ নেকড়ে খোঁড়া পায়ে গুটিগুটি এগোচ্ছে। শিকারের এক উন্মাদ নেশায় দু-পক্ষই উদগ্রীব। নির্জন প্রান্তরের মাঝ দিয়ে দুটি প্রাণী নিজেদের মৃতপ্রায় দেহদুটোকে টেনে নিয়ে চলেছে।

নেকড়েটা সুস্থ হলে ওর এত মাথা ঘামানোর কিছু থাকত না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকে দিয়ে এই মৃতপ্রায় ঘৃণ্য নেকড়েটা ওর ক্ষুধার্ত পেট ভরাবে, এ চিন্তা অত্যন্ত অপ্রীতিকর। মনটা খুঁত খুঁত করছে। আবার চিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে পড়ছে। কতগুলো মায়াদৃশ্য ওকে বিভ্রান্ত করে তোলে। এখন ও আর সুস্থভাবে কিছুই ভাবতে পারছে না। সুস্থভাবে চিন্তা করার অবকাশই পাচ্ছে না।

একেবারে কানের কাছে একটা ফোঁসফোঁসানির শব্দে সম্বিৎ ফিরে পায় লোকটি। নেকড়েটা লেঙচে পালাতে গিয়ে পায়ের জোর হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। খুবই হাস্যকর দৃশ্য। কিন্তু একটুও মজা পায় না লোকটি, অবশ্য ভয়ও পায় নি। ভীতি নামক পদার্থটিকে সে কবে হারিয়ে বসেছে। এই দৃশ্য ওকে সুস্থভাবে ভাবতে সুযোগ করে দেয়। শুয়ে শুয়ে তাই ভাবে, কী করা উচিত। এখান থেকে জাহাজটার দূরত্ব চার মাইলের বেশি নয়। চোখের জল মুছে তাকিয়ে এখান থেকেই জাহাজটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে আর সেই সঙ্গে দেখছে সাদা পাল তোলা একটি নৌকা ঝলমলে সমুদ্রের বুক চিরে এগোচ্ছে। কিন্তু এই চার মাইল পথ ওর পক্ষে যে কোনোভাবেই হামাগুড়ি দিয়ে পার হওয়া সম্ভব নয় তা ও জানে এবং জেনেও ও ওর কর্তব্য কর্মে অবিচল। ভালো করেই বুঝতে পারছে আর আধ মাইল পথও পার হতে পারবে না—তবু ও বাঁচতে চায়। এতদিন ধরে এত সঙ্কটের মোকাবিলা করার পরও ওকে মরতে হবে মরতে হবে একথা ও মানতে রাজি নয়। তাছাড়া এটা অযৌক্তিক। মানুষটির ওপর দুর্ভাগ্যের দাবির যেমন অন্ত নেই, তেমনি সেও কিছু কম যায় না। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও সে মৃত্যুকে অস্বীকার করছে।

চোখ বুঁজে অতি সতর্ক ভাবে নিজের ওপর নিজের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনে। তীরের ওপর আছড়ে পড়া উত্তাল ঢেউয়ের মতো ওর অস্তিত্বের রন্ধ্রে যে শ্বাসরোধকারী অবসন্নতা ক্রমাগত ওকে আঘাত হানছে তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে ও জয়ী হতে চায়। বাঁচার সংগ্রামে মরণকে অস্বীকার করতে চায়। এই মারাত্মক অবসন্নতার প্রকৃতি সমুদ্রের মতো, ধীরে ধীরে ফুলে ফেঁপে উঠে চৈতন্যকে গ্রাস করে। কখনো কখনো ও নিমজ্জিত হয়ে পড়ে অবসন্নতার সমুদ্রে, বিস্মৃতির অতলে তখন এলোমেলো ভাবে হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতরায়। আবার কখনো অজ্ঞাত অদ্ভুত প্রাণ-রসায়নের দৌলতে মনোবলের ভগ্নাবশেষ ফিরে পায় এবং আবার উদ্যমে রুখে দাঁড়ায়।

লোকটি একেবারে নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকে, অসুস্থ নেকড়েটা ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে, হাঁসফাঁস শব্দ থেকেই টের পেয়েছে। মনে হয় অনন্ত কাল ধরে ওটা ক্রমশ কাছেই এগিয়ে আসবে লোকটি একটুও নড়ে না। কানের গোড়ায় এসে পৌঁছেছে নেকড়েটা। গালের ওপর জন্তুটার কর্কশ জিভের স্পর্শ শিরিষ কাগজ ঘষার মতো লাগে। ঝটিতে দুটো হাত প্রসারিত করে—ওর নখগুলো বাজপাখির ফলার মতো তীক্ষ্ণ। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, মুঠোর মধ্যে শুধু খানিকটা বাতাস আটকা পড়ে।

সাংঘাতিক ধৈর্য নেকড়েটার। অবশ্য লোকটির ধৈর্যও কিছু কম নয়। দিনের অর্ধেকটা নিশ্চলভাবে শুয়েই কাটিয়ে দেয়। যাতে না বেড়ঁশ হয়ে পড়ে তার জন্যে ক্রমাগত নিজের সঙ্গে লড়াই করে চলে। প্রতীক্ষা করে, কখন নেকড়েটা ওকে খেতে আসে এবং শেষ পর্যন্ত ওরই খাদ্য হয়। কখনো কখনো লোকটি অবসন্নতার অতলে তলিয়ে যায় এবং সুদীর্ঘ সব

স্বপ্ন দেখে, কিন্তু এই নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যেও লোকটি সদা প্রতীক্ষাবত। শুধু ভাবে এই বুঝি কানের কাছে নিশ্বাসের শব্দ শুনল, এই বুঝি কর্কশ জিভটার সোহাগ স্পর্শ ওকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলল।

নিশ্বাসের শব্দটা কিন্তু লোকটি শুনতে পায় নি, তখন ও স্বপ্ন দেখছিল। শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে তন্দ্রা কেটে যায়, বুঝতে পারে নেকড়েটা জিভ দিয়ে হাত চাটছে। লোকটি সুযোগের অপেক্ষা করে। থাবাগুলো আলতোভাবে চাপ দিচ্ছে। চাপটা আরো বাড়ে। নেকড়েটা সুদীর্ঘকাল যার জন্যে প্রতীক্ষা করেছে, সেই খাদ্যের ওপর দাঁত বসাবার চেষ্টায় সব শক্তিটুকুকে সযত্নে ব্যবহার করছে। লোকটিও দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করেছে। এবার ওর রক্তাক্ত দন্তবিদীর্ণ হাতখানা নেকড়েটার চোয়ালটাকে চেপে ধরে। নেকড়েটা দুর্বলভাবে যুঝছে—আর লোকটিও দুর্বলভাবে মুঠো পাকিয়ে রেখেছে। শেষ পর্যন্ত লোকটি ধীরে ধীরে অন্য হাতটা দিয়ে নেকড়েটাকে প্যাঁচ ক্ষ্যালে। মিনিট পাঁচেক পেরোবার পর দেখা যায় লোকটির পুরো দেহের ওজনের তলায় নেকড়েটা পিষ্ট হচ্ছে। নেকড়েটাকে যে টুঁটি টিপে মারবে, ওর কব্জিতে সে জোর নেই। শেষ পর্যন্ত লোকটি দাঁত বসিয়ে দেয় নেকড়ের গলায়। মুখ ঢেকে গেছে বড় বড় লোমে। আধ ঘণ্টাখানেক পর লোকটি বুঝতে পারে গলা দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে উষ্ণ রক্ত নামছে। অনুভতিটা সুখপ্রদ নয়। এ যেন গলিত সীসা গিলতে বাধ্য হওয়া। আর এই বাধ্য হবার পেছনে রয়েছে তার নিজেরই প্রতিজ্ঞা। খানিকটা পরেই লোকটি চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

তিমি শিকারের জাহাজ বেডফোর্ড-এ ছিলেন কজন বিজ্ঞানী। ওদের দল বৈজ্ঞানিক পর্যটনে বেরিয়েছে। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে ওঁরা তীরের কাছে অদ্ভুত একটা জন্তু লক্ষ্য করেন। জন্তুটি তীর বেয়ে সমুদ্রের দিকে এগোচ্ছে। এটি যে কী তা তাঁরা অনুমান করতে পারেন না। ওঁরা তখন জাহাজের সঙ্গে লাগোয়া একটি নৌকায় চড়ে বসেন। অনুসন্ধান করতে তীরের দিকে রওনা দেন। তীরের ওপর যাকে ওঁরা পড়ে থাকতে দেখলেন তার প্রাণ আছে বটে, কিন্তু তাকে মানুষ বলা খুব শক্ত। লোকটি অন্ধ, বেঁড়শ। কীটের মতো মাটির ওপর কিলবিল করছে। এগোবার জন্যে এই দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা বহুলাংশেই বিফল হচ্ছে তবু লোকটি নাছোড়বান্দা। লোকটি ঘণ্টা পিছু কুড়ি ফুটও বোধহয় এগোতে পারছিল না।

তিন সপ্তাহ পরে লোকটি বেডফোর্ড-এর একটি শয্যায় শুয়ে বলবার চেষ্টা করছিল, সে কে এবং কেন সে এখানে এসেছিল। ওর হাড় বার করা গাল বেয়ে অঝোরে ঝরছিল অশ্রু। ওর অসংলগ্ন অনর্গল কথা থেকে এটুকু বোঝা যাচ্ছিল যে লোকটি তার মায়ের কথা বলছে। সূর্যকরোজ্জ্বল দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার কথা আর কমলালেবুর বাগান ঘেরা ছোট্ট একটা বাড়ির কথা।

এরপর খাবার টেবিলে বিজ্ঞানী ও জাহাজের অফিসারদের সঙ্গে যোগ দিতে ওর আর বেশিদিন সময় লাগে না। খাদ্যসম্ভারের বহর দেখে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে লোকটি। অন্যরা খাবার তুলে মুখে পোরার সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্বিগ্ন দেখায়। এক এক গ্রাস খাদ্য অদৃশ্য হয় আর অমনি ওর দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে এই গভীর অনুতাপ।

লোকটি এখন পুরোপুরি প্রকৃতিস্থ বটে কিন্তু খাবার সময় ও এদের কাউকে সহ্য করতে পারে না। মজুত খাদ্য ফুরিয়ে যাবার আতঙ্ক ওকে যেন পেয়ে বসেছে। পাচক, কেবিন বয় আর ক্যাপ্টেন-ভাঁড়ারে কতটা কী আছে না আছে প্রত্যেকের কাছে খোঁজ নিয়েছে। বারবার আশ্বস্ত করা সত্ত্বেও ওদের কথা বিশ্বাস করতে পারে না। নিজের চোখে দেখবে বলে

চোরের মতো ভাঁড়ারের আশপাশে ছুঁক ছুঁক করে বেড়ায় লোকটি।

লোকটি দিন দিন মোটা হতে শুরু করেছে। বিজ্ঞানীরা চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে আলাপ আলোচনা করেছেন এবং ওর জন্যে বরাদ্দ খাদ্যের পরিমাণটা কমিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তবু ওর পেটের বহর দিন দিন বাড়তেই থাকে—সার্টের তলায় বিস্ময়করভাবে ভুঁড়িটা ফুলে ওঠে। নাবিকরা মিটিমিটি হাসে। ওরা ব্যাপারটা জানে। শেষ পর্যন্ত কয়েকদিন চোখে চোখে রাখার পর বিজ্ঞানীরাও ব্যাপারটা জানলেন। ওঁরা দেখলেন, প্রাতরাশের পর লোকটি ভিক্ষুকের মতো ঝুঁকে পড়ে একজন নাবিকের সামনে হাত বাড়িয়ে ধরলো। নাবিকটি হেসে জাহাজি বিস্কুটের এক টুকরো ওকে দিল। লোভীর মতো ও মুঠো করে ধরে বিস্কুটটা আর এমনভাবে চেয়ে দ্যাখে যেন মনে হয় সে এক কৃপণ সোনার তালের সন্ধান পেয়েছে। তারপর সার্টের তলায় বিস্কুটটা লুকিয়ে ফেলে। অন্য নাবিকরাও হাসতে হাসতে ওকে বিস্কুট দেয়। বিজ্ঞানীরা কথাটা জানতে পেরেও চেপে গেলেন। লোকটিকে ওরা ঘাঁটালেন না কিন্তু গোপনে ওর শোবার বাঙ্কে তল্লাশি চালালেন। দেখা গেল জাহাজি বিস্কুটে বাঙ্ক ভর্তি, জাহাজি বিস্কুটে গদি ঠাসা, প্রতিটি আনাচে কানাচে গোঁজা রয়েছে জাহাজি বিস্কুট। অথচ লোকটি অপ্রকৃতিস্থ নয়। সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে মাত্র। বিজ্ঞানীরা বললেন, এটা সাময়িক। সানফ্রান্সিসকো বেতে বেডফোর্ড নোঙর ফেলার আগেই বিজ্ঞানীদের কথা সত্যি প্রমাণিত হল।

বিধর্মী

প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। যদিও একই জাহাজে আমরা সেই ঝড় থেকে রেহাই পেয়েছিলাম, তবু প্রথম তার ওপর আমার দৃষ্টি পড়েছিল দুই মাস্তুলঅলা জাহাজটি আমাদের পায়ের নিচে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার পর। জাহাজের ওপরে অন্যান্য কানাকা মাল্লার সঙ্গে আমি হয়ত তাকে দেখে থাকব কিন্তু 'পেটি জেন'-এর অতিরিক্ত ভিড়ের মধ্যে তার কথা মনে করে রাখবার দরকার পড়ে নি। আট-দশজন কানাকা নাবিক, শ্বেতাঙ্গ ক্যাপ্টেন, মেট এবং মালবাবু আর কেবিনের ছয়জন যাত্রী ছাড়াও পঁচাশি জনের মতো পমোতান আর তাহিতিয়ান নারী-পুরুষ-শিশু আরোহী নিয়ে 'পেটি জেন' রঙ্গিরোয়া থেকে যাত্রা করেছিল। এদের প্রত্যেকের হাতেই একটি করে কারবারি বাক্স, শোবার মাদুর ছিল। কম্বল আর কাপড়চোপড়তো ছিলই।

পমোতায় মুক্তো সংগ্রহের মৌসুম শেষ হয়েছে। সবাই ফিরে যাচ্ছে তাহিতিতে। আমরা ছ'জন কেবিন যাত্রী মুক্তোর কারবারি—মুক্তোর ক্রেতা আমাদের মধ্যে আছে দুজন আমেরিকান, আহ্‌চুন নামে একজন চীনা (এমন শ্বেতাঙ্গ চীনা আমি কখনো দেখি নি), একজন জার্মান, একজন পোলান্ডীয় ইহুদি আর আমি—সব মিলে একেবারে আধডজন।

এবারকার মৌসুমটা ছিল লাভজনক। কি আমরা, কি পঁচাশি জন ডেক আরোহী, কারোরই কোনো অভিযোগ নেই। সবাই ভালো কারবার করেছে। একটু বিশ্রাম নিতে জাহাজ থামবে পাপিতিতে। সেখানে কিছু সময় আনন্দে কাটানোর আশায় সবাই আগ্রহে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে।

বাস্তবিকই, জাহাজটি মাত্রাতিরিক্ত বোঝাই করা হয়েছিল। 'পেটি জেন'-এর ক্ষমতা সত্তর টন। কিন্তু তার ওপর যত লোক উঠেছে, সত্যি বলতে কি, তার দশ ভাগের এক ভাগ বহন করাই তার পক্ষে দুঃসাধ্য। পাটাতনের নিচের জায়গাটা নারকেলের শুকনো শাঁস আর ঝিনুকে ঠাসাঠাসি করে বোঝাই করা, একতিল ফাঁক নেই। দোকানঘরটাও ঝিনুকেই ভর্তি। মাল্লারা যে কিভাবে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এটাই ভাববার মত। ডেকের ওপরে নড়াচড়ার কোনো সুযোগ নেই। গরাদ ধরে ধরে অবলীলায় তাদেরকে ওঠানামা করতে হচ্ছে।

রাত্রিবেলা মাল্লারা ঘুমন্ত মানুষগুলোর ওপর দিয়েই হেঁটে গেছে। কী বলব, সেই ডেকের ওপর আবার শূয়োর ছানা, মুরগির বাচ্চা আর সকরকন্দের বস্তাও রাখা হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেকটা আপাত ফাঁকা জায়গায় ডাবের মালা আর কলার ছড়ি সাজিয়ে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। সামনের এবং প্রধান পালের টানার মধ্যে উভয় দিকেই নিচু করে অনেকগুলো দড়ি টাঙানো হয়েছে যাতে সামনে পালদণ্ড ঘুরতে বাধা না পায়। আর এই সব দড়ির প্রত্যেকটাতে অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ ছড়ি করে কলা ঝুলছে।

আমাদের যাত্রাপথ নিরুপদ্রব নয় বলেই মনে হল, যদিও দক্ষিণ পূর্ব বাণিজ্য বায়ু পেইলে আমরা দু-তিনদিনেই সে পথ অতিক্রম করতে পারি। কিন্তু সে সুযোগ হল না। প্রথম পাঁচ ঘণ্টার পর দশ-বারোবার দমকা হাওয়া দিয়ে সেই বাণিজ্য বায়ু দূরে হারিয়ে গেল। তারপর একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইল অবারিত প্রকৃতি। সমস্ত রাত এবং পরবর্তী

সমস্ত দিন ধরে একটা গুমোট নিস্তব্ধতা বিরাজ করল। এ সেই চোখ-ধাঁধানো স্বচ্ছ গুমোট প্রকৃতি—যার দিকে তাকানোর কথা ভাবলেই মাথা ধরে যায়।

দ্বিতীয় দিন একজন মারা গেল। ইস্টার দ্বীপের অধিবাসী ছিল লোকটা। সে মৌসুমের শ্রেষ্ঠ লেগুন ডুবুরিদের একজন। জানতে পারলাম তার গুটিবসন্ত হয়েছিল। কিন্তু আমার ধারণাতেই এল না, আমাদের জাহাজে এই রোগটা কী করে আসতে পারে। কারণ, রঙ্গিরোয়া থেকে যখন আমরা যাত্রা করি তখন সেখানকার উপকূল অঞ্চলে এই রোগের কোনো প্রমাণ পাই নি। তবু সেই বসন্তেই একজন মরল এই জাহাজে এবং আরো তিনজন আক্রান্ত হয়ে শয্যা নিয়েছে।

করার কিছুই ছিল না। না আমরা রোগীদেরকে আলাদা রাখতে পারছিলাম, না তাদের কোনো সেবা করতে পারছিলাম। সার্ডিন মাছের মতো গাদাগাদি করে আছি সবাই, ঐ অবস্থায় পচে মরা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। প্রথম লোকটা মারা যাবার পর যে রাত এল সে রাতের পরেও আমরা কিছু করতে পারলাম না। সে রাতেই মেট, মালবাবু, সেই পোলান্ডীয় ইহুদি এবং চারজন দেশীয় ডুবুরি তিমি শিকারের বিরাট একটি ডিঙিতে করে সরে পড়ল। পরে তাদের আর কোনো খবর পাওয়া যায় নি। পরদিন সকালে ক্যাপ্টেন অবশ্য অবশিষ্ট সব ডিঙ্গা ফুটো করে অকেজো করে দিল ফলে। আমরা সেখানেই রয়ে গেলাম।

পরের দিনই মারা গেল দুজন, তার পরদিন তিনজন, তারপর সেই সংখ্যা লাফিয়ে আটে উঠল। আমরা যে কীভাবে স্থির থাকতে পারলাম ভাবতে আশ্চর্য লাগে। নেটিভদের কথাই ধরা যাক ; আতঙ্কে ওদের বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, বোবা হয়ে গিয়েছিল ওরা। জাহাজের ফরাসি ক্যাপ্টেন—নাম ওদোজে—ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে প্রলাপ বকতে শুরু করল। অন্তত দুশো পাউন্ড ওজনের তার বিরাট মাংসল বপু, দেখতে দেখতেই তা সে থলথলে চর্বির একটি কম্পমান স্তূপে রূপান্তরিত হল।

সেই জার্মান ভদ্রলোক, আমি আর আমেরিকান দুজন মিলে সব কটা স্কচ-হুইস্কির বোতল কিনে এনে প্রচুর মদ খেতে লাগলাম। মাতাল হয়ে বাঁচার প্রয়াস! প্রয়াসটা সুন্দর—ভাবটা এমন আমরা যদি মদে ডুবে থাকতে পারি তাহলে প্রতিটি বসন্তের জীবাণু আমাদের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঝলসে অঙ্গার হয়ে যাবে, এতে অবশ্য কাজও হল। অবশ্য ক্যাপ্টেন ওদোজে কিংবা আহ্‌চুন কেউই সে রোগে আক্রান্ত হয় নি। ফরাসি ক্যাপ্টেন তো মোটেই মদ খেত না, আর আহ্‌চুন সারাদিনে মাত্র একবার।

ঋতুটা সুন্দর। উত্তরায়নগামী সূর্য ঠিক মাথার ওপর। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস ছাড়া কোনো হাওয়া নেই! পাঁচ মিনিট থেকে আধঘণ্টা স্থায়ী এই দমকা বাতাস তীব্রভাবে আসে। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি হয় এবং আমরা ভিজতে থাকি। তারপর আবার মেঘের ভিতর থেকে প্রকাণ্ড সূর্য বেরিয়ে আসে। প্রতিটা ঝটকার পরে প্রখর রৌদ্রের তাপে ভেজা পাটাতন থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে ভাপ ওঠে।

ভাপটা অস্বস্তিকর। লক্ষ লক্ষ জীবাণু ভর্তি মৃত্যুর দূত যেন। সেই ভাপ কোনো মুমূর্ষু কিংবা মৃতের লাশের ওপর দিয়ে উঠতে দেখলে আমরা আরেকবার বেশ করে পান করে নিই। তাছাড়া, যখনই ওরা জাহাজের চারদিকে জড়ো হওয়া হাঙরগুলোর মুখে লাশ ছুঁড়ে ফেলে তখনই পানের মাত্রা চড়িয়ে দেওয়াটা আমরা নিয়মসিদ্ধ করে নিয়েছি।

এমনিভাবে এক সপ্তাহ চলল। একসময় হুইস্কি ফুরিয়ে গেল। জিনিসটা সত্যিই ভালো ছিল, নইলে আজ পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকতাম না। ওটাই আমার মত একজন নির্জীব

মানুষকে সকল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পেরিয়ে আসার উদ্যম দিয়েছিল। অসংখ্য মৃত্যু অতিক্রম করে মাত্র দুজন লোকই শেষ পর্যন্ত নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের সেই ছোট্ট কাহিনীটা বর্ণনা করলে কথাটা আপনিও মানবেন। দুজনের একজন সেই বিধর্মী। আমি যখন তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম তখন ক্যাপ্টেন ওদৌজে ও নামেই তাকে ডাকল। যাক, এবার আগের কথায় ফিরি।

সপ্তার শেষ। হুইস্কি ফুরিয়ে গেছে। মুক্তোর কারবারিরা নির্জীব হয়ে ঝিমোচ্ছে। আমি কেবিনের সরু করিডোরে ঝুলন্ত ব্যারোমিটারের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছি। পমোতানে এর স্বাভাবিক স্থিতি ছিল ২৯.৯০তে। এরমধ্যে আমরা ২৯.৮৫ থেকে ৩০.০০ এমন কি ৩০.০৫-এর মধ্যে পারদের ওঠানামা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ ২৯.৬২তে পারদ নেমে আসতে দেখলে স্কচ-হুইস্কিতে বসন্তের জীবাণু পুড়িয়ে নেয়া সব চাইতে মাতাল ব্যক্তিরও মাথা ঠাণ্ডা হতে বাধ্য। আমি তাই দেখলাম।

ক্যাপ্টেন ওদৌজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম সেদিকে। তাকে শুধু জানালাম ব্যাপারটা। সেও কয়েক ঘণ্টা ধরে পারদের নেমে যাওয়া পর্যবেক্ষণ করল। অবশ্য করবার ছিল সামান্যই। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে ক্যাপ্টেন সেই সামান্যটুকুই ভালোভাবে সমাধা করল। ছোট পালগুলো নামিয়ে ঝড়ের জন্যে সব পাল নিয়ন্ত্রিত মাপে গুটিয়ে আনল এবং 'লাইফ লাইন' হাতের কাছে ছড়িয়ে নিয়ে বাতাসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু বাতাস আসার পরই ভুল করে বসল ক্যাপ্টেন। বাতাসের মুখে পালের ওপর নির্ভর করেই গতি ফিরিয়ে নিল। বিষুবরেখার দক্ষিণে থাকলে এবং সরাসরি ঝড়ের মধ্যে না পড়লে সামনের বাধা অতিক্রমের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা ফলবতী হত।

কিন্তু হাওয়ার বেগের ক্রমোন্নতি আর তার সঙ্গে তাল রেখে ব্যারোমিটারে পারদের ক্রমাবনতি আমাকে স্পষ্ট ধারণা দিল যে আমরা সরাসরি ঝড়ের মুখেই আছি। ক্যাপ্টেনকে বললাম: জাহাজ ঘুরিয়ে বাতাসের অনুকূলে চালিয়ে দাও; তারপর ব্যারোমিটারে পারদের নেমে আসা বন্ধ হয়ে গেলে ঢেউ কেটে রওনা হওয়া যাবে। কিন্তু সে আমার সঙ্গে তর্ক শুরু করে দিল এবং তর্ক করতে করতে হিস্টিরিয়া রোগীর মতো খিঁচিয়ে উঠল, তবু তার নিজের সিদ্ধান্ত থেকে নড়ল না একটুও। সব চাইতে দুঃখ পেলাম এজন্যে যে মুক্তোর কারবারিদের কাউকেই আমার সমর্থনে পেলাম না। আমি জানতাম তারা সন্দেহ করছে, আমি সমুদ্র আর সমুদ্রের পথঘাট সম্বন্ধে আদৌ কিছু জানি কিনা? ঠিকই তো, একজন যোগ্য এবং অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেনের চেয়ে এব্যাপারে বেশি জ্ঞান আমার কী করে থাকতে পারে?

বাতাসের বেগের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রও ভয়ঙ্করভাবে ফুলে ফুলে উঠল। 'পেটি জেন' যেভাবে প্রথম তিনটি উত্তাল তরঙ্গ পেরিয়ে এসেছিল তা আমি কোনোদিন ভুলব না। বাইচের ছোট্ট নৌকার মতো বিশাল জলরাশির আঘাতে প্রথমে সে ছিটকে গেল। প্রথম তরঙ্গের ধাক্কাটা তো তাকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেল। নারী আর শিশু, কলা আর ডাব, শূকর ছানা আর বাক্স-পেটরা, রোগী আর মুমূর্ষু সব এক সঙ্গে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে ফুঁসে ওঠা জলরাশিতে ভেসে গেল। 'লাইফ লাইনে'র সাহায্য নিতে পারল শুধু শক্ত সমর্থ কজন।

দ্বিতীয় তরঙ্গের প্রবল দাপটে পেটি জেনের ডেক দুপাশের গরাদ পর্যন্ত জলমগ্ন হয়ে গেল। পেছনটা ডুবে গেল জলের মধ্যে। সামনের গলুই উঁচিয়ে উঠল আকাশের দিকে। দুর্দশাগ্রস্ত জীবন আর মালপত্র সবই পেছন দিয়ে সমুদ্রে গড়াতে লাগল। এ যেন মানুষেরই

একটা দলাপাকানো প্রপাত। কেউ সামনে মাথা দিয়ে, কেউ পা দিয়ে, কেউ আড়াআড়ি একের ওপর এক ঘুরপাক খেতে খেতে গড়িয়ে আসতে লাগল। যাঁতা খেতে খেতে, মোচড়াতে মোচড়াতে, হুমড়ি খেতে খেতে ওরা গড়াগড়ি খেল। বার বার তারা মুষ্ঠি করে চেপে ধরতে চাইল ঝুলন্ত রশি, কিন্তু শরীরের ওজনে তা শিথিল হয়ে যেতে লাগল।

একজনকে দেখলাম উঠে এসে গুঁতো খেল খোলের শক্ত পাটাতনের খাঁজে—এক সঙ্গে মাথায় আর কাঁধে। একটা ডিমের মতো ভেঙে গেল তার মাথাটা। ধাবমান তরঙ্গের রূপটা আমি দেখতে পেলাম! লাফিয়ে উঠে গেলাম কেবিনের ছাদে এবং সেখান থেকে মূল বাদামের মাস্তুলের খোলে। আহ্‌চুন এবং দুজন আমেরিকানের একজন আমাকে অনুসরণ করছিল কিন্তু আমি ওদের থেকে একধাপ এগিয়ে ছিলাম। আমেরিকানটা একটা কুটোর মতো জাহাজের পেছন দিয়ে ভেসে গেল। আহ্‌চুন জাহাজ চালানোর চাকার একটি শিক ধরে ঝুলতে লাগল। কিন্তু সেখানে পেটি বাঁধা একজন রারোটাঙ্গার মেয়েমানুষ (চলতি ভাষায় এদের 'ওয়াহিন' বলে)—ওজনে অন্তত আড়াইশো পাউন্ড হবে—আহ্‌চুনের মুখোমুখি হয়ে একহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল, অন্য হাতে জড়িয়ে ধরল হালের কানাকা নাবিককে।

লাশ আর তরঙ্গের প্রবল স্রোত কেবিন আর গরাদের মধ্যবর্তী মাল নামানোর ফাঁকা জায়গার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল, হঠাৎ স্রোতের গতি খোলের দিকে ঘুরে গেল। 'ওয়াহিন', আহ্‌চুন আর সেই হালের মাল্লা—সব একসঙ্গে ভেসে গেল সমুদ্রে। আমি নিশ্চিত দেখলাম গরাদ থেকে ছিটকে নিচে পড়ে যাবার সময় আহ্‌চুন আমার দিকে হতাশ দার্শনিকের মতো তাকিয়ে কাষ্ঠহাসি হাসল।

তৃতীয় তরঙ্গ—তিনটের মধ্যে বৃহত্তম সে তরঙ্গ; অবশ্য আমাদের আর বেশি কিছু ক্ষতি করতে পারল না। যখন ঢেউটা এল তখন সবাই মৃত্যুর কথাই ভাবছে। ডেকের ওপর প্রায় ডজন খানেক অর্ধনিমগ্ন, অর্ধচেতন মানুষ খাবি খেতে খেতে গড়াচ্ছে কিংবা বুকে হেঁটে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার চেষ্টা করছে। অবশিষ্ট নৌকা দুটোর ভগ্নাবশেষের মতোই তারা খোলের পাশ দিয়ে গড়িয়ে গেল। অন্যান্য মুক্তো কারবারিদের সঙ্গে আমি ঢেউ আসার বিরতিতে পনেরজনের মতো নারী ও শিশুকে উদ্ধার করে কেবিনে আটকে রাখার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ব্যবস্থা তাদের কোনো উপকারেই লাগল না।

আর বাতাস? বাতাস যে এত বেগে বইতে পারে আমার সব অভিজ্ঞতা একসঙ্গে করেও তা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এর কোনো বর্ণনা দেয়া যায় না। নিশীথ রাত্রির দুঃস্বপ্নকে কি কেউ বর্ণনা করতে পারে? ঝড়টাও ছিল তেমনি দুঃস্বপ্নের মতো। সে বাতাস আমাদের শরীর থেকে সমস্ত কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে গেল। আমি বলি না এসব বিশ্বাস করুন; আমি যা দেখেছিলাম এবং অনুভব করেছিলাম তাই শুধু বলছি। মাঝে মাঝে আমিও এখন সে সব কিছু বিশ্বাস করে উঠতে পারি না। তবু আমি তার মধ্যে পড়েছিলাম এবং এটাই আসল কথা। সে বাতাসের মুখোমুখি পড়লে কেউ বাঁচতে পারে না। সে যেন এক মহাপ্রলয়ের তাণ্ডব। তবে সবচাইতে ভয়ঙ্কর অবস্থা হল এই যে সে বাতাসের বেগ বেড়ে গেল এবং ক্রমাগত বাড়তেই লাগল।

ধরুন, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টন বালু এবং সেই বালু ঘণ্টায় নব্বই, একশো, একশো কুড়ি মাইল কিংবা তার চেয়েও অনেক অনেক বেশি বেগে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে উড়ে চলেছে। আরো মনে করুন সে বালু অদৃশ্য, সূক্ষ্ম কিন্তু তাতে বালুর স্বাভাবিক ভার ও ঘনত্ব বিদ্যমান। এই সমস্ত কিছু ভাবুন, তাহলেও হয়ত সেই বাতাসের একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত পেতে পারবেন।

হয়ত বালু দিয়ে তার সঠিক উপমা দেওয়া গেল না মনে করুন, কাদা—অদৃশ্য, অতি সূক্ষ্ম কিন্তু কাদার মতোই ভারী কিছু। না, এ তার চেয়েও বেশি। মনে করুন, বায়ুর প্রতিটি পরমাণু যুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছে সে কাদার স্তূপ। এখন ভাবুন সেই কাদার স্তূপের ঘনত্বের বিপুল চাপ কেমন হতে পারে। না, এ আমার কল্পনার বাইরে। ভাষার সাহায্যে জীবনের সাধারণ অবস্থা হয়তো ব্যক্ত করা যায়, কিন্তু সেই ভয়াবহ ঝড়ের প্রবল বেগের কথা কোনোভাবেই ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে না।

তবে শুধু এটুকু বলব—যে সমুদ্রতরঙ্গ প্রথমে স্ফীত হয়ে ফুঁসে উঠেছিল, ঝড়ের হাওয়ার আঘাত তার মাথা নামিয়ে নিল। আরো মনে হল, সেই প্রচণ্ড ঝড়ের ঘূর্ণাবর্তকে সমগ্র জলরাশি শুষে নিয়ে বাতাসের জায়গা দখল করতে যেন শূন্যে ছুঁড়ে মারছে।

আমাদের পালের ক্যানভাস অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। 'পেটি জেন' জাহাজে ক্যাপ্টেন ওদোঁজের একটা অদ্ভুত নোঙর ছিল। সাউথ সির জাহাজগুলোতে আমি এ ধরনের নোঙ্গর কোনোদিন দেখি নি। ত্রিকোণ একটা ক্যানভাসের ব্যাগ। মুখে বিরাট একটা লোহার বালা লাগানো—তাতে লাগাম-মুখটা সব সময় খোলা থাকে। সেই নোঙরের সঙ্গে ঘুড়ির মতো লাগাম বাঁধা—যাতে সহজেই সেটা জল কেটে যেতে পারে, ঘুড়ি যেমন করে বাতাস কেটে আকাশে ওঠে তেমনিভাবে। অবশ্য এই কেটে চলার একটু আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। জাহাজের সঙ্গে একটা লম্বা দড়িতে বাঁধা নোঙরটা সমুদ্রতলের একটু নিচে খাড়া হয়ে থাকত। ফলে সেই ঝড়ের তরঙ্গের মুখে 'পেটি জেন' গলুই উঁচিয়ে চলতে লাগল।

ঝড়ের মুখে না পড়লে আমাদের কিছুই হত না। ঝড় আমাদের পালের ক্যানভাসগুলো ছিঁড়ে নিয়ে গেল, মাস্তুলগুলোর মাথা থর থর করে কাঁপিয়ে জাহাজ চালানোর যন্ত্রটার সঙ্গে রীতিমতো খেলা শুরু করে দিল । তবু আমরা হয়ত ভালোভাবেই আসতে পারতাম কিন্তু ঝড়ের কেন্দ্রেবিন্দু এগিয়ে এসে আমাদের বোধহয় চারদিক থেকে বেঁধে ফেলল। আমি যেন খেই হারিয়ে ফেললাম। পঙ্গুর মতো নিঃসাড় হয়ে পড়লাম আমি, বাতাসের বেগ আর চাপ অনুভবের সব ক্ষমতা চলে গেল। মনে পড়ে সেই আবর্ত থেকে যখন চূড়ান্ত আঘাত এসে লাগল তখন আমি সব আশা ছেড়ে দিয়ে মরতেই চলেছিলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধাক্কাটা এল অন্যভাবে। টের পেলাম একটা দম আটকানো থমথমে ভাব। অনুভব করলাম আমাদের চারপাশে, নিশ্বাস নেবার মতোও হাওয়া যেন নেই কোথাও। ফলে মড়ার মতো পড়ে থাকা ছাড়া উপায় রইল না।

সেই ভয়ঙ্কর চাপের মধ্য থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা নিদারুণ দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করলাম। তারপর হঠাৎ একসময় বাতাসের চাপ কমে গেল। মনে আছে তখন কি দেহ বিস্তার করে চারদিকে উঠে যেতে ইচ্ছে করছিল আমার। মনে হল আমার দেহের প্রতিটি অণুপরমাণু একে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু করেছে, মুহূর্তের অবকাশে অবাধ্য গতিতে উড়ে যেতে চাইছে মহাশূন্যে। কিন্তু এমন অবস্থা বেশিক্ষণ রইল না। আমাদের ওপর তখন ধ্বংস নেমে আসছে।

বাতাসে চাপ না থাকায় সমুদ্রের জল ফুলে উঠল। লাফাতে লাগল তরঙ্গের পর তরঙ্গ এগিয়ে এল। ফুঁসে ওঠা সমুদ্রের জলরাশি যেন উড়ে যেতে চায় আকাশের মেঘের কাছে। জলের বালতির তলা থেকে কাক ছেড়ে দিলে যেমন ছিটকে ওঠে তেমনি ছিটকে উঠছে ঢেউগুলো। কোনো নিয়ম নেই, কোনো স্থিতি নেই সেই ফাঁকা, উন্মত্ত সমুদ্রতরঙ্গের। কমপক্ষে আশি ফুট উঁচু হয়ে আসছে। এ যেন তরঙ্গই নয়। মানুষের দেখা কোনো তরঙ্গের মতোই নয়।

এক-একটি ঢেউ যেন এক-একটি জলের কিংবা কাদার আছড়ে পড়া স্তূপ। হ্যাঁ, বিশাল স্তূপ—আশি ফুট উঁচু। আশি। না, তারও বেশি হবে। আমাদের মাস্তুলের চেয়েও উঁচু। ক্ষিপ্রগতি, বিস্ফোরক, প্রমত্ত। যখন খুশি তখনই ঊর্ধ্বে উঠে যেখানে খুশি সেখানে ভীষণ শব্দে ভেঙে পড়ছে। পরস্পরকে আঘাত করছে। দুটি ঢেউ প্রবল বেগে পরস্পরের দিকে ছুটে এসে মিশে এক হয়ে যাচ্ছে কিংবা সংঘর্ষের পর সহস্র প্রপাতের মতো দুদিকে ছিটকে পড়ছে।

সেই প্রচণ্ড ঝড়ের মহাসমুদ্রকে কল্পনা করাও কঠিন। এ যেন একটা ভ্রান্তি, বার বার মনকে বিভ্রমে ফেলে। এ যেন এক ঘোর অরাজকতা, এ যেন নরকের অতলস্পর্শ গহ্বরে উন্মত্ত সমুদ্রের বিপুল বিক্ষোভ!

আর সেই 'পেটি জেন' জাহাজ? আমি বলতে পারব না। পরে সেই বিধর্মী বলেছিল, সেও জানে না 'পেটি জেনে'র কথা। হয়ত ভেঙে গেছে। খুলে পড়েছে তার সারা শরীর। হয়ত কোনো ভেসে যাওয়া গাছের গুঁড়ির সঙ্গে আঘাত খেয়েছে, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্নই হয়ে গেছে। আমি সমুদ্রের মধ্যে পড়ে তখন প্রাণপণে সাঁতরাচ্ছি। একরকম ডুবেই গিয়েছিলাম আমি। এ অবস্থায় যে কী করে রক্ষা পেলাম মনে করতে পারছি না। তবে আমার মনে আছে, যখন নিজের চোখে 'পেটি জেন'কে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখলাম তখন আমার ভেতর থেকে সমস্ত চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল। শেষ চেষ্টা করতে বিলম্ব করলাম না কিন্তু তাতে কোনো আশার আলো দেখলাম না। আবার বাতাস বইতে শুরু করল। ঢেউগুলোকে তখন ছোট আর নিয়ন্ত্রিত মনে হল। আমি বোধহয় তখন সেই কেন্দ্র পার হয়ে এসেছি। সৌভাগ্যবশত আশপাশে কোনো হাঙর ছিল না। যে হিংস্র অতৃপ্ত দস্যুর দল আমাদের মৃত্যুতরীটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধিরেছিল আর লাশগুলো দিয়ে রসনা নিবৃত্ত করছিল, প্রবল পরাক্রান্ত সেই ঝড় এসে ছিন্নভিন্ন করে তাদেরও কোথাও অদৃশ্য করে দিয়েছে।

ঠিক দুপুরের দিকে 'পেটি জেন' ধ্বংস হল। তার প্রায় দুঘণ্টা পর আমি ভাসতে ভাসতে তার পাটাতনের একটা কাঠ ধরতে সক্ষম হলাম। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে তখন। কাঠটাকে দুহাতে চেপে ধরে আছি কোনোমতে। যে কোনো মুহূর্তে ফসকে যাবার সম্ভাবনা। লেজের মতো এক টুকরো দড়ি আটকানো ছিল কাঠটাতে। বুঝতে পারলাম এভাবে একদিন অন্তত বেঁচে থাকতে পারব, অবশ্য এর মধ্যে যদি হাঙর এসে না পড়ে। ঘণ্টা তিনেক কিংবা তারও একটু পর, আমি যখন কাঠটাকে আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরেছি এবং শেষ পর্যন্ত চলবার শক্তি অর্জনের জন্যে চোখ বুঁজে প্রাণপণে শুধু বুক ভরে নিশ্বাস নিতে চেষ্টা করছি আর মাঝে মাঝে নিশ্বাস বন্ধও করছি যাতে বেশি করে নিশ্বাস নিতে গিয়ে গভীর জলে ডুবে না মরি, তখন মনে হল আমি যেন কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। বৃষ্টি থেমে গেছে। বাতাস এবং সমুদ্র দুই-ই শান্ত। অবাক হয়ে দেখলাম, আমার থেকে বিশ ফুটেরও কম দূরে আরেকটা কাঠের টুকরোয় ভাসছে ক্যাপ্টেন ওদোজে আর সেই বিধর্মী। কাঠটাকে পুরোপুরি দখল করার জন্যে দুজনেই যুদ্ধ করছে, বিশেষ করে ফরাসিটা তো রীতিমতো হাতপা ছুঁড়তে শুরু করেছে।

'এই কালো কুত্তা!' ফরাসি ক্যাপ্টেন চিৎকার করে উঠেই কানাকার মুখে মারল এক লাথি। ওদোজের গায়ে কিছুই ছিল না, শুধু পায়ে একজোড়া জুতো, তাও ভারী ব্রোজান। বিধর্মীটার মুখে সেই ব্রোজানের লাথি খুব জোরেই লেগেছিল। একসঙ্গে মুখে এবং চিবুকে আঘাত পেয়ে সে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। আমি চাচ্ছিলাম বিধর্মীটা এর প্রতিশোধ

নিক। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে শান্তভাবে সাঁতরিয়ে দশ ফুট ব্যবধানে চলে গেছে। যখনই সমুদ্রের ঢেউ তাকে কাছে ঠেলে আনে তখনই ফরাসিটা কাঠটাকে শক্ত করে চেপে ধরে জোড়া পায়ে কানাকাকে লাথি মারতে থাকে। প্রতিবার লাথি মারবার সময় সে মুখ খিঁচিয়ে বলে ওঠে—'বেটা বিধর্মী, কালো ভূত !'

'এই সাদা জানোয়ার, মুহূর্তের মধ্যে ওখানে গিয়ে আমি তোমাকে ডুবিয়ে মারতে পারি শয়তান !' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

ও পর্যন্ত গেলাম না, তার একমাত্র কারণ আমি তখন অত্যন্ত ক্লান্ত। সাঁতরানোর কথা মনে হতেই মাথা ঘুরে উঠছিল। তাই কানাকাকেই নিজের কাছে ডেকে এনে আমারই কাঠের একটা অংশ ওকে ছেড়ে দিলাম। ওর নাম ওটু। আমাকে বলার সময় উচ্চারণ করল: ও-টু-উ। নিজের আরো পরিচয় দিয়ে বলল যে সে সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জের সর্ব পশ্চিমে অবস্থিত বোরাবোরার অধিবাসী। পরে শুনলাম যে সে-ই আগে কাঠটা ধরেছিল। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর সে নিজেই ক্যাপ্টেন ওদৌজেকে একটা অংশ ছেড়ে দেয়। কিন্তু ওদৌজে তাকেই লাথি মেরে সরিয়ে দিয়েছে।

এমনিভাবে ওটু আর আমি একসঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম। সে যোদ্ধা ছিল না, যোদ্ধার কোনো গুণই তার মধ্যে আমি দেখতে পাই নি। বড় মিষ্টি, বড় নম্র স্বভাবের লোক ছিল ওটু। ভালোবাসার একটি সার্থক প্রতিমূর্তি যে অথচ লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। একজন রোমান সৈনিকের মতোই সুঠাম তার দেহ। অবশ্য যোদ্ধা না হলেও সে কাপুরুষ ছিল না কোনো কালেই। সিংহের মতো বলিষ্ঠ তার মন। পরবর্তীকালে সে এমন মারাত্মক মারাত্মক কাজ করেছে যা করার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। সে যোদ্ধা ছিল না, সব সময় হাঙ্গামাও এড়িয়ে চলত। কিন্তু আমি দেখেছি বিপদ এলে সে কখনো পিছু হটত না। তখন আমরা 'ওয়্যার শোল' জাহাজে। ওটু একদিন তুমুল লড়াই বাধিয়ে বসল। আমি কোনোদিন ভুলব না বিল কিংকে কী মারটাই না সে দিয়েছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল জার্মানদের সামোয়া দ্বীপে। আমেরিকান নৌবাহিনীতে বিল কিং ছিল শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা। পশুর মতো হিংস্র বিপুলকায় একটা মানুষ। যেন একটা আস্ত গরিলা। সব সময় হুড়োমি, রূঢ় ব্যবহার আর মাঝে মাঝে কায়দামাফিক আঁতেঘাতে ঘুষি মারা তার স্বভাব। সে-ই প্রথম হাঙ্গামা শুরু করল। ওটুকে পরপর দুবার লাথি মেরে ফেলে দিল। তার সাথে লড়বার প্রয়োজন বোধ করবার আগে আরেকবার সে ওটুকে আঘাত করল। বোধহয় ওদের লড়াই চার মিনিটও টিকল না। এর মধ্যেই বিল কিং-এর বুকের চারটা পাঁজর গুঁড়িয়ে গেছে, একটা হাত ভেঙেছে, কাঁধের ওপর একটা হাড় খুলে গেছে। ওটু মুষ্টিযুদ্ধের কোনো বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি জানত না। সে জানত শুধু কী করে লোক শায়েস্তা করতে হয়। তাতেই এপিয়া সৈকতে বিল কিংকে এমন শায়েস্তা করেছিল যে সুস্থ হয়ে উঠতে তার তিন মাস সময় লেগেছিল।

কিন্তু আমি যেন আমার গল্পের আগে আগে চলছি। আমরা দুজনে কাঠটা ভাগাভাগি করে নিলাম। মাঝে মাঝে আমরা পালা বদল করে একজন চুপ করে শুয়ে থেকে বিশ্রাম নিই আর একজন গলা পর্যন্ত জলে ডুবে থেকে শুধু হাত দিয়ে ঠেলতে থাকি কাঠটা। দুইদিন দুই রাত্রি ধরে বহু কষ্টে পালা করে করে কখনো জলে ডুবে, কখনো কাঠে শুয়ে আমরা সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলতে লাগলাম। শেষের দিকে আমি একরকম ভুল বকতেই শুরু করলাম। মাঝে মাঝে শুনতাম ওটুও তার মাতৃভাষায় বিড়বিড় করে কী সব বকছে। সারাক্ষণ জলে থেকে থেকে সারা শরীর একেবারে শিথিল-সিক্ত হয়ে পড়েছিল বলে তীব্র পিপাসাতেও আমরা কাহিল হই নি। জিভে সমুদ্রের লোনা জলের স্বাদ আর পিঠে সূর্যের

রোদ মিলে যেন এক বিচিত্র অনুভবের আবর্তে ডুবে ছিলাম।

অবশেষে ওটুই আমার জীবন রক্ষা করেছে। সমুদ্র থেকে বিশ ফুট দূরে এসে নারকেল গাছের দুটি পাতার ছায়ায় সৈকতের বালুর ওপরেই আমি শুয়ে পড়লাম। ওটু ছাড়া আর কেউ ছিল না আমার পাশে। সে-ই আমাকে ধরে এনে এখানে শুইয়ে দিয়েছে। গাছের পাতা পেড়ে এনে প্রখর রোদ আড়াল করে দিয়েছে। ওটু আমার পাশেই শুয়েছিল। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন জাগলাম, আমার চারপাশে এক শীতল রাত্রি বিরাজমান। আকাশে অসংখ্য তারাভরা সুন্দর শীতল রাত্রি। তাকাতেই দেখি ওটু একটা ডাব কেটে আমার ঠোঁটের কাছে ধরে আছে।

'পেটি জেন' জাহাজের আমরা দুজনেই কেবল বেঁচেছি। কাপ্তেন ওদোঁজে হয়ত এতক্ষণে সমুদ্রের সাথে সংগ্রাম করতে করতে চিরকালের জন্যে শান্ত হয়ে পড়েছে। কদিন পর দেখলাম তীরের কাছ দিয়ে তার কাঠটা একা একা ভেসে যাচ্ছে। আমি আর ওটু এক সপ্তা সেই প্রবালদ্বীপে নেটিভদের সঙ্গে থাকলাম। তারপর এক ফরাসি ক্রুজার আমাদের সেখান থেকে উদ্ধার করে তাহিতিতে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যেই আমরা নাম বদলের পর্বটা শেষ করে ফেলেছিলাম। সাউথ সি অঞ্চলে এমনি নাম বদলের পর্ব দুটি মানুষকে রক্তের সম্বন্ধের চেয়েও বেশি ভ্রাতৃত্ববোধে আপন করে তোলে। উদ্যোগটা আমিই নিয়েছিলাম। আমার সম্বন্ধের প্রস্তাব শুনে ওটু অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠল।

'চমৎকার হল।' তাহিতির ভাষায় সে বলল, 'আমরা দুই দিন এক সঙ্গে মৃত্যুর মুখে বন্ধু হয়েই তো ছিলাম।' 'কিন্তু মৃত্যু আমাদের কাছে হেরে গেছে।' আমি হেসে বললাম।

'তুমি একটা সাহসিকতার কাজই করেছ বটে, মাস্টার,' সে উত্তর দিল, 'তাই মৃত্যু আর কিছু করতে সাহস পেল না।'

'তুমি আমাকে মাস্টার বলে ডাকলে কেন?' আমি ব্যথিত হয়েছি এভাবে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমরা তো নাম বদল করেছি। তোমার কাছে আমি ওটু আর আমার কাছে তুমি চার্লি। তোমার ও আমার মধ্যে চিরকালের জন্যে তুমি হবে চার্লি আর আমি ওটু হয়ে রইব। এই তো আমাদের জীবনের রীতি। তারপর আমরা যেদিন মরে যাব—মৃত্যুর পর আবার যদি এমন হয় যে আমরা ওই তারা আর আকাশের পারে কোনোখানে জীবন ফিরে পাই, তাহলে সেদিনও তুমি আমার কাছে চার্লি আর আমি তোমার কাছে ওটু হয়েই থাকব।'

'ঠিক বলেছ, মাস্টার, তুমি ঠিক বলেছ।' আনন্দে তার চোখ দুটো চক চক করে উঠল।

'আবার সেই সম্বোধন?' আমি রেগে উঠে বললাম।

'তাতে কী আছে!' সে বলে চলল, 'ওগুলো তো কেবল আমার মুখের কথা, কিন্তু আমি 'ওটু'র কথা সর্বদা স্মরণ রাখব। যখনই নিজের কথা ভাবব তখনই তোমার কথা মনে করব। যখনই লোকে আমাকে নাম ধরে ডাকবে, তোমার কথা আমার মনে পড়বে। ওই তারা আর আকাশের পারেও তুমি চিরকাল আমার কাছে ওটু হয়ে থাকবে। এবার হল তো, মাস্টার?'

আমি হাসি গোপন করে বললাম, 'হয়েছে।'

পাপিতিতে আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। সে এক ছোট্ট জাহাজে চড়ে নিজের দ্বীপ বোরাবোরাতে চলে গেল। আমি পাপিতির তীরে তার ফিরে আসার প্রতীক্ষায় রইলাম। ছয় সপ্তা কেটে গেল। তারপর একদিন সে ফিরে এল। তাকে পেয়ে ভালো লাগল ঠিকই কিন্তু পরক্ষণেই অবাক হলাম তাকে ফিরে আসতে দেখে। সে আমার কাছে তার

স্ত্রীর কথা বলেছিল। বলেছিল যে সে তার স্ত্রীর কাছেই ফিরে যাচ্ছে। স্ত্রীর সাথেই সে তার অবশিষ্ট জীবনটা কাটাবে, দূর সমুদ্রযাত্রায় সে আর কোনোদিন বের হবে না।

'তুমি কোথায় যেতে চাও, মাস্টার?' আমাদের প্রথম আলিঙ্গনের পর সে প্রশ্ন করল।

আমি কাঁধ ঝাঁকি দিলাম। প্রশ্নটা বড় শক্ত। বললাম, 'গোটা বিশ্বে, সমগ্র পৃথিবীতে, সমস্ত সাগরে, সাগরের সবগুলো দ্বীপে যাব আমি।'

'আমিও তোমার সঙ্গেই যাব।' অবলীলায় বলল সে, 'আমার স্ত্রী মারা গেছে।'

আমার নিজের কোনো ভাই ছিল না। অপরের অনেক ভাই দেখেছি, কিন্তু আমার ওটুর মতো ভাই আর কার থাকতে পারে এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমার কাছে সে নিছক ভাই-ই ছিল না, সে ছিল আমার কাছে বাবার মতো, মা'র মতো। আমি জানি শুধু ওটুর জন্যেই আমি একটি সহজ উন্নত জীবন কাটাতে পেরেছি। অন্য কারো পরোয়া করি না, কিন্তু ওটুর সামনে আমাকে খুব সহজভাবে চলতে হত।

শুধু তারই জন্যে আমি বেপরোয়া জীবনযাপন করতে সাহস পাই নি। সে আমাকে তার আদর্শ করে রেখেছিল; তার পবিত্র অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে সে আমাকে মহান করে তুলেছিল। মাঝে মাঝে অধঃপতনের তীরে দাঁড়িয়ে নরকের কলঙ্কের মাঝে ডুবে যেতে বসেছি, কিন্তু ওটুর ভাবনাই আমাকে সবকিছু থেকে ফিরিয়ে এনেছে। আমাকে নিয়ে তার যে গর্ব সে গর্ব আমার মধ্যে এসে আমাকেও কেমন অহংকারী করে তুলত। যা কিছু তার সেই অহংকারকে ক্ষুণ্ন করে তেমন কিছু না করাটা শেষ পর্যন্ত আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটা অমোঘ নীতিতে পরিণত হল।

কিন্তু স্বভাবতই আমার প্রতি তার সঠিক মনোভাব আমি সরাসরি বুঝে উঠতে পারলাম না। সে আমার কোনো কাজেরই সমালোচনা করত না। আমাকে কোনো কিছুতেই বাধা দিত না। ক্রমে তার চোখে আমি যেন একটা পবিত্র সম্মানীয় কিছু হয়ে উঠলাম। আমার সকল কাজে শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ না রাখলে তার মনে যে আঘাত লাগে ধীরে ধীরে তা বুঝতে পারলাম।

সতের বছর আমরা একসঙ্গে থেকেছি। ওটু এই সতের বছর আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থেকেছে। আমি ঘুমোলে সে জেগে জেগে আমাকে পাহারা দিয়েছে। অসুস্থ কিংবা আহত হলে সে আমার সেবা করেছে। আমার জন্যে লড়াই করতে গিয়ে নিজে আহত হয়েছে। এক সঙ্গে আমরা হাওয়াই থেকে সিডনি হেড, টেরেস স্ট্রেইট থেকে গ্যালাপাগোস—গোটা প্রশান্ত মহাসাগরটা ঘুরেছি। নিউ হেব্রিডস এবং লাইন দ্বীপপুঞ্জ থেকে একেবারে পশ্চিমে যাত্রা করে লুইসিয়াডস, নিউ ব্রিটেন, নিউ আয়ারল্যান্ড, নিউ হ্যানোভার পর্যন্ত ব্ল্যাকবার্ডে যোগ দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। গিলবার্টস, সান্তাক্রুজ এবং ফিজি দ্বীপপুঞ্জে তিন তিনবার আমরা জাহাজ ডুবিতেও পড়েছি।

আমরা উপার্জন করেছি প্রচুর। যেখানেই আমরা মুক্তো বা ঝিনুক, নারকেলের শাঁস বা ফলের রস, সামুদ্রিক কচ্ছপ কিংবা চড়ায় আটকানো জাহাজের ভাঙা অংশের কারবারে একটি ডলার মুনাফারও আশা দেখেছি, সেখানেই আমরা নেমেছি। ব্যবসা করেছি। কেনাবেচা করে লাভবান হয়েছি।

পাপিতি থেকেই এর শুরু। যখন সে বলল আমার সাথে সেও সমুদ্রে সমুদ্রে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরবে তখন থেকেই এই কারবারের আরম্ভ। তখন পাপিতিতে একটা ক্লাব ছিল। সেখানে মুক্তোর ব্যাপারী, সাধারণ ব্যবসায়ী, জাহাজের ক্যাপ্টেন, সাউথ সি অঞ্চলের দুর্ধর্ষ লোকগুলো এসে দেদার মদ খেত আর জুয়া খেলত। গভীর রাত পর্যন্ত আমিও সেই ক্লাবে

থাকতাম। অবশ্য ভয় হত, ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে কিনা। আমি নিরাপদে ঘরে ফিরেছি কিনা দেখতে ওটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করত।

প্রথমে ওর দিকে চেয়ে হাসতাম; পরে একটু তিরস্কারই করলাম। তারপর একদিন স্পষ্ট করে বলেই দিলাম যে তার ওসব অযথা সেবাযত্নের আমার প্রয়োজন নেই। এরপর আমি ক্লাব থেকে ফিরে এসে তাকে দেখতাম না। সপ্তাহখানেক পর হঠাৎ করেই তাকে একদিন দেখে ফেললাম। এখনো সে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে আমগাছগুলোর ফাঁক দিয়ে আমার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে। এখন আমি কী করতে পারি? আমি তো জানি, আমি কী করছি।

অবিবেচকের মতো আমি আরো বেশি রাত করতে লাগলাম। কিন্তু ঝড়বৃষ্টির রাতে, এমনকি হাসিতামাশার হুল্লোড়ের মধ্যেও, সেই আমবনের ফাঁক দিয়ে ওটু যে আমার ওপর কড়া নজর রাখছে সে যেন জোর করে আমার মাথায় এসে ঢুকত। যথার্থই ওটু আমাকে ভালো মানুষ করে তুলেছে। কিন্তু সে আমার সঙ্গে সহজ হয়ে উঠতে পারছে না। খ্রিস্টানদের সাধারণ নৈতিকতার কোনো জ্ঞানই তার নেই। বোরাবোরার সবাই খ্রিস্টান। তাদের মধ্যে ওটুই শুধু বিধর্মী। দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে সে-ই একমাত্র অবিশ্বাসী। ঘোর বস্তুবাদী মানুষ সে। বিশ্বাস করে তার মৃত্যুর পরে সবই শেষ হয়ে যাবে। ন্যায্য ব্যবহার ও সমমর্যাদাবোধের প্রতি সে চরম আস্থাশীল। তার মতে সংকীর্ণতা হীনমন্যতা নরহত্যার মতো ঘোরতর অপরাধ। আমার ধারণা অধঃপতিত মানুষের চেয়ে একজন হত্যাকারীকেই সে বেশি সমীহ করত।

আমার কথাই বলি। জীবনের জন্যে ক্ষতিকারক কোনো কাজ করতে সে আমাকে বার বার নিষেধ করেছে। জুয়া খেলায় সে অবশ্যি কোন দোষ দেখত না কারণ সে নিজেই একজন পাকা জুয়াড়ি।

'কিন্তু রাত জাগা তো স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।' সে আমাকে বুঝিয়ে বলত 'আমি দেখেছি অনেক লোক নিজের শরীরের যত্ন না নেওয়ায় জ্বরে ভুগে মরেছে।'

সে নিজেও একেবারে মাদকতাবর্জিত ছিল না। স্যাঁতস্যাঁতে নৌকায় কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে সেও কড়া মাত্রার টিপ টিপ চড়াত। মদেও তার আপত্তি ছিল না। কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে নয়। সে দেখেছে সারাজীবন অপর্যাপ্ত স্কচ হুইস্কি টেনে টেনেই কতজন মারা গেছে, একেবারে অকর্মণ্য হয়ে গেছে কেউ কেউ।

ওটু সব সময়েই মনে মনে আমার কল্যাণ কামনা করত। সব সময় আমার ভবিষ্যৎ চিন্তা করত। আমার প্রতি পরিকল্পনাকে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করত এবং তাতে আমার চেয়েও বেশি আগ্রহ প্রকাশ করত। আমার কাজে তার এই অসীম আগ্রহের অর্থ আমি প্রথমে বুঝতে পারতাম না, তখন সে গণকের মতো আমার কাজের ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা বলে দিত। পাপিতিতে একবার ঘটেছিল এরকম। আমি আমারই দেশের এক প্রবঞ্চক ব্যবসায়ীর অংশীদার হয়ে গুয়ানা যাত্রার বন্দোবস্ত করেছিলাম। আগে জানা ছিল না যে লোকটা একটা উঁচুদরের প্রবঞ্চক। পাপিতির কোনো শ্বেতাঙ্গও সঠিক জানত না। ওটুও প্রথম জানত না, কিন্তু যখন দেখল আমি ধীরে ধীরে সেই ঠগটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ছি তখন সে আমার কিছু বলার অপেক্ষা না করেই তার খপ্পর থেকে আমাকে সরিয়ে এনেছিল। সমুদ্রের দূর কিনার থেকে নেটিভ নাবিকের দল তাহিতির বন্দর এসে হাজির হত, সন্দিগ্ধ ওটু তাদের মধ্যে গিয়ে সবরকম খোঁজখবর সংগ্রহ করে নিজের মনের সন্দেহকে নিশ্চিত করে ফেলত। সেই র‍্যানডলফ সাগরের কাহিনীটা সত্যিই চমকপ্রদ! ওটু

যখন গল্পটা আমাকে প্রথম শোনাল আমার তো বিশ্বাসই হল না। তারপর আমি যখন সেই জলপথে বাড়ি আসতে চাইলাম, ওটু কোনো কথা না বলে শুধু সম্মতি জানাল এবং প্রথম জাহাজে উঠেই অকলান্ড যাত্রা করল।

একথা স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই যে প্রতি কাজে ওটুর নাক গলানো প্রথমে আমার বিরক্তির কারণ ছিল। কিন্তু আমি জানতাম ওটু স্বার্থশূন্য লোক। প্রথম না হলেও পরে আমাকে তার জ্ঞানবুদ্ধির মহত্ত্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। আমার ব্যবসার প্রতিটি সুযোগের মুহূর্তে সে তার দৃষ্টি সজাগ রাখত শুধু তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষকই নয়, সে ছিল অত্যন্ত দূরদর্শী। আমার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে আমার চাইতে বেশি তথ্য জেনে নিয়ে সে আমাকে উপদেশ দিতে চেষ্টা করত, যথার্থই আমার চেয়ে আমার স্বার্থের ব্যাপারে খেয়াল তার মনে অনেক বেশি থাকত। আমার মধ্যে ছিল যৌবনের অশান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা। ডলার উপার্জন করার চাইতে রোমান্স করার এবং সারারাত চুল্লির পাশে আরাম করার চাইতে অ্যাডভেঞ্চারের দিকেই আমার ঝোঁক ছিল বেশি। এমন অবস্থায় আমাকে একটু দেখাশোনা করবার কেউ থাকায় ভালোই হয়েছিল। আমি জানি সেদিন আমার জীবনে যদি ওটু না আসত তাহলে আজ পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকতাম না।

তার অকৃত্রিম বন্ধুত্বের অনেক উদাহরণ আছে। পমোতাসে মুক্তোর কারবার করতে যাবার আগে থেকেই ব্ল্যাক বার্ডিং-এর কিছু অভিজ্ঞতা আমার ছিল। আমি আর ওটু তখন সামোয়ার সৈকতে। সেই সৈকতের মাটিতেই তখন আস্তানা গাড়তে হয়েছিল আমাদের। এর পরপরই একটা ব্ল্যাক বার্ড ব্রিগেডে রিক্রুটার হবার সুযোগ পেয়েছিলাম আমরা। ওটুও আমার সঙ্গে গিয়েছিল। ছয় বছর ধরে বিভিন্ন জাহাজে আমরা মেলানেশিয়ার ঘন জঙ্গলগুলো ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। দ্বীপের মধ্যে চলাফেরা করার সময় ওটু সব সময় আমার নৌকার দাঁড় টানত। দ্বীপ থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করার নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে জাহাজের রিক্রুটারকে তীরে নামিয়ে দেওয়া হত। জাহাজটা তীরের কয়েকশো ফুট দূরে জলের ওপর দাঁড় প্রস্তুত রেখে ভেসে থাকত।

সেই অবস্থায় একদিন হাল খোলা রেখেই কারবারের মালপত্র নিয়ে আমি নৌকা থেকে নেমে পড়তেই, ওটু তখন দাঁড় টানার জায়গা ছেড়ে পেছন দিকটার পাটাতনের কাছে গিয়ে বসল। সেখানে ক্যানভাসের আবরণের নিচে একটা উইনচেস্টার রাইফেল হাতের কাছে প্রস্তুত। নৌকার মাল্লাটাও সশস্ত্র। তার কাছে ক্যানভাসের নিচে বন্দুকের মতোই স্লিডার লুকানো ছিল। দ্বীপের সেই কোঁকড়ান চুলঅলা অসভ্যদের যখন আমি কুইন্সল্যান্ডের চাষের কাজে যাবার জন্য তর্ক করে করে বোঝাচ্ছিলাম, ওটু তখন কড়া পাহরা রেখেছিল এবং মাঝে মাঝে চাপা কণ্ঠে ডেকে ওই অসভ্যদের সন্দিগ্ধ আচরণ আর নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে আমাকে সাবধান করে দিচ্ছিল। কখনো কখনো রাইফেলের ক্ষিপ্র আওয়াজ করে সে আমাকে সতর্ক করে দিত—সেটাই পয়লা হুঁশিয়ারি। অসভ্যদের আক্রমণের ভয়ে যখন নৌকার দিকে ছুটে যেতাম ওটু তার দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে রাখত আমাকে নৌকাতে তুলে নেবার জন্য। আমার মনে আছে, একবার, সান্টানায় নৌকো থেকে কেবল তীরে নেমেছি অমনি অসভ্যরা আমাদের আক্রমণ করল। আমাদের সহায্য করতে জাহাজটা এগিয়ে আসছিল। কিন্তু ওটা এসে পৌছবার আগেই অসভ্যরা আমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলত। ওটু একলাফে তীরে নেমে আমাদের কারবারের সব মাল বের করে দুহাতে ছড়াতে লাগল—সেই তামাকের পাতা, চকচকে পাথরের মালা, লোহার বড় বড় কুঠার, সুন্দর বাঁটঅলা চাকু, নকশা করা কাপড়—সব।

অসভ্যরা ওগুলো দেখে পাগল হয়ে গেল। লুটপাট শুরু করে দিল। আর সেই সুযোগে আমরা নৌকায় উঠে নির্বিঘ্নে চল্লিশ ফুট দূরে সরে গেলাম। এতে লাভ হয়েছিল বেশ। পরবর্তী চার ঘণ্টার মধ্যে আমি সেখান থেকেই তিরিশ জন শ্রমিক সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম।

যে ঘটনাটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা ঘটেছিল মালাইতায়। সলোমন দ্বীপপুঞ্জের পূর্বাঞ্চলে মালাইতার অধিবাসীরাই সবচেয়ে বেশি অসভ্য। কিন্তু নেটিভদের দেখে যে রকম বন্ধুভাবাপন্ন মনে হল তাতে আমরা কী করে বুঝব যে একটা শ্বেতাঙ্গের মাথা কেনার জন্যে ওরা দুই বছর ধরে চাঁদা তুলে টাকা জমাচ্ছে? এখানকার সব ভিক্ষুকই মাথা শিকার করে বেড়ায়। বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গের মাথা পেলে তো কথাই নেই; যে মাথাটা আনতে পারবে চাঁদার সব টাকা সে-ই পাবে। আমি আগেই বলেছি ওদের দেখলে এমনিতে বেশ বন্ধু বলে মনে হত। সেদিন আমি তীরে নৌকা রেখে প্রায় একশো গজ দূরে ওদের দ্বীপের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। ওটু আমাকে প্রথমেই সাবধান করেছিল। তখন তার কথায় কান না দিয়ে পরে অনুতাপ করেছি।

মনে আছে, হঠাৎ একটা জলাভূমির ঝোপের ভিতর থেকে বৃষ্টির মতো বর্শার ঝাঁক ছুটে এল আমার দিকে। অন্তত ডজনখানেক আমার গায়ে এসে বিঁধল। আমি ছুটতে শুরু করলাম। কিন্তু একটা বর্শা আমার গোড়ালিতে এসে বিঁধতেই আমি পড়ে গেলাম। অসভ্যগুলো প্রকাণ্ড সব কুঠার হাতে আমার মাথা কাটার জন্যে ছুটে আসতে লাগল। শ্বেতাঙ্গ মানুষের মাথা কেটে পুরস্কার পাওয়ার জন্যে ওরা নিজেদের মধ্যেই প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল। সেই বিভ্রান্তির মধ্যে বালুর ওপরে একবার এদিক একবার ওদিক পড়ে গিয়ে কোনোমতে কুঠারের কোপ থেকে নিজেকে কয়েকবার রক্ষা করলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ওটু এসে উপস্থিত। শায়েস্তা করতে সে জানে। কেমন করে যেন ওটু একটা ডাণ্ডা যোগাড় করেছিল। শত্রুর একেবারে কাছ থেকে যুদ্ধ করতে রাইফেলের চেয়েও ডাণ্ডা বেশি কাজে আসে। সে বুদ্ধি করে ওদের দলের ভিতর ঢুকে গেল যাতে ওরা বর্শা ছুঁড়তে না পারে। কুঠারগুলোও আর কোনো কাজে এল না। ওটু আমার জন্যেই যুদ্ধ করছিল। সত্যিই ওটু অসভ্যদের ওপর ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। আশ্চর্যভাবে সে লাঠিটা চালাতে লাগল। বাড়ি লেগে ওদের মাথাগুলো পাকা কমলালেবুর মতো ফেটে যেতে লাগল। তারপর অসভ্যগুলোকে একেবারে তাড়িয়ে দিয়ে আমাকে তার হাতের ওপর তুলে নিয়ে দৌড়াতে লাগল। তখনই প্রথম আঘাত এসে লাগল তার গায়ে। যখন এসে নৌকাতে উঠল তখন দেখলাম ওটুর গায়ে চারটে বর্শা লেগেছে। উইনচেস্টার রাইফেলটা হাতে তুলে নিল সে আর এক একটি গুলিতে এক-একটি করে অসভ্যের প্রাণ শেষ করতে লাগল। তারপর আমরা জাহাজে এসে উঠলাম এবং ডাক্তার ডাকা হল।

সতের বছর আমরা একসঙ্গে ছিলাম। এই দীর্ঘকাল ধরে আসলে সে-ই আমাকে গড়ে তুলেছে। সে না থাকলে এতোদিনে আমি বড়েজোর একজন মালবাবু অথবা রিক্রুটার হতাম কিংবা এক টুকরো স্মৃতি হয়ে থাকতাম শুধু।

'টাকা সব খরচ করে ফেলছ। তারপর আবার বেরিয়েছ; আরো টাকা পাচ্ছ।' সে একদিন বলছিল, 'টাকা উপায় করা এখন সোজা। কিন্তু তুমি যখন বুড়ো হবে তখন তোমার সব টাকা খরচ হয়ে যাবে। তুমি তখন আর বাইরেও বের হতে পারবে না, আর টাকাও উপার্জন করতে পারবে না। আমি জানি মাস্টার। তোমাদের শ্বেতাঙ্গদের জীবনযাত্রাপ্রণালী আমার সব জানা আছে। ঐ যে দেখ সৈকতে কত বুড়ো; এককালে

তারাও যুবক ছিল। তোমার মতো তারাও একদিন প্রচুর টাকা কামিয়েছে। কিন্তু আজ তার বুড়ো হয়ে গেছে, আজ তারা নিঃস্ব। তোমাদের মতো যুবকের পথ চেয়ে বসে থাকে ওরা—তীরে এলে তোমাদের কাছ থেকে পয়সা চেয়ে মদ কিনে খাবে।

'ওই যে কালো ছেলেটা, ওতো একটা ক্রীতদাস। চাষের কাজ করানোর জন্যে ওকে ওরা ধরে এনেছে। কঠোর পরিশ্রম করে ! অথচ বছরে মাত্র বিশ ডলার পায়। ওভারসিয়ার সাহেবটা তো কোনো কাজই করে না। ঘোড়ার পিঠে বসে থেকে শুধু ছেলেটার কাজ তদারক করে। আর তারই জন্যে সে পায় বছরে বারোশ ডলার। আমি জাহাজের একজন নাবিক। আমি পাই মাসে পনেরো ডলার। তাও পাই কারণ আমি একজন ভালো নাবিক এবং খুব পরিশ্রম করি তাই। ক্যাপ্টেনের মাথার ওপরে জোড়া চাঁদোয়া। বড় বড় বোতল থেকে সে বিয়ার খায়। কোনোদিন তাকে আমি একটা দাঁড় ধরতে বা একটা রশি টানতে দেখি নি। তাও সে পায় মাসে দেড়শো ডলার। আমি একজন সামান্য নাবিক আর সে জাহাজের ক্যাপ্টেন। মাস্টার, তুমি জাহাজের ক্যাপ্টেন হতে পারলে খুব ভালো করতে।'

ওটু আমাকে এ ব্যাপারে খুব উৎসাহ দিয়েছিল। প্রথম জাহাজে সে আমার দ্বিতীয় মেট হয়ে সমুদ্রযাত্রা করেছিল এবং সেই সময় আমি তার ওপরে কোনো আদেশ জারি করলে সে তাতে আমার চেয়েও বেশি গর্বিত হত।

ওটু বলে চলল, 'ক্যাপ্টেন বেশি মাইনে পেলেও জাহাজটা কিন্তু তারই দায়িত্বে থাকে। এক মুহূর্তও সে তার দায়িত্বের বোঝা থেকে অব্যাহতি পায় না। জাহাজের মালিকই বেশি টাকা আয় করে। মালিক তার চাকরবাকর নিয়ে তীরে বসে থাকে আর টাকা বাড়িয়ে চলে।'

'তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু একটা জাহাজ কিনতে অন্তত পাঁচ হাজার ডলারের দরকার। তাও আবার পুরোনো জাহাজই কিনতে হবে ও টাকায়।' আমি বাধা দিয়ে বললাম। "পাঁচ হাজার ডলার সঞ্চয় করার আগেই তো আমি বুড়ো হয়ে যাব।'

'শ্বেতাঙ্গদের টাকা উপার্জন করার তো সহজ পথই আছে।' তীরের কাছেই নারকেল গাছে ঘেরা সৈকতের দিকে ইঙ্গিত করে বলল ওটু।

সে সময়টা আমরা সলোমন দ্বীপপুঞ্জে। গুয়াডেল ক্যানালের পূর্বতীর ধরে শ্বেত বাদামের পশরা সংগ্রহ করছি।

'নদীর এ মুখ থেকে আরেক মুখের দূরত্ব দুমাইল।' ওটু বলতে লাগল, 'ঐ সমতল ভূমিটা পেছনের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এখন এর এক আধলাও দাম নেই। কিন্তু কে জানে আগামী বছর কিংবা তার পরের বছর লোকে ঐ জায়গাটুকুই অনেক দামে কিনবে। নোঙর ফেলতে খুব সুবিধে এখনে। বড় বড় জাহাজ একেবারে ধার ঘেঁষে দাঁড়াতে পারে। তুমি মাত্র দশ হাজার আঁটি তামাকের পাতা, দশ বোতল মদ আর আন্দাজ একশো ডলার দামের একটা স্লিডার দিয়ে বুড়ো সর্দারের কাছ থেকে চার মাইল বিস্তৃত এই জমিটা কিনে নিতে পার। তারপর কমিশনারকে বলে দলিল ঠিক করে নিয়ে আগামী বছর কিংবা তার পরের বছর চড়া দামে জায়গাটা বিক্রি করে দিয়ে একটা জাহাজের মালিক হয়ে যেতে পার।'

আমি তার পরামর্শ গ্রহণ করেছিলাম। সে যা বলেছিল তাই ঘটল শেষ পর্যন্ত। তবে দুবছরে নয়, তিন বছর লেগেছিল। তারপর এল গুয়াডাল ক্যানালের তৃণভূমি কেনার পালা। সামান্য টাকায় সরকারের কাছ থেকে নশো নিরানব্বই বছরের জন্যে বিশ হাজার একর জমি ইজারা পেলাম। আমি সর্বমোট নব্বই দিন সে ইজারা ভোগ করেছি। তারপর এক কোম্পানির কাছে অর্ধেক লাভে বিক্রি করে দিয়েছি। এসব কাজে ওটু ভবিষ্যৎ চিন্তা

করে সুযোগ গ্রহণ করত তার জন্যেই মাত্র একশ পাউন্ডে ডনকাস্টারের নীলাম ধরে সমস্ত খরচা বাদে তিন হাজার পাউন্ড লাভ পেয়েছিলাম। সাভাইয়ের আবাদ এবং উপলুর কোকোর কারবারের দিকে সে-ই আমাকে চালিত করেছিল।

আগের মতো আমরা আর অত সমুদ্রযাত্রায় বেরুতাম না। আমি তো অনেকখানি সংসারী হয়ে গেছি। বিয়ে করেছি। আমার জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। কিন্তু ওটু? আগের সেই ওটুই রয়ে গেছে! তেমনি মন্থর গতিতে বাড়ির মধ্যে চলাফেরা করে। অফিসে যায়। মুখে সেই কাঠের পাইপ। গায়ে এক শিলিং-এর একটা শার্ট। চার শিলিং-এর 'লাভা লাভা' কোমরের সঙ্গে জড়ানো। আমি তাকে দিয়ে টাকা খরচ করাতে পারতাম না। তার কাছে আমার ঋণ একমাত্র অন্তরের অকৃত্রিম ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু দিয়ে পরিশোধ করবার উপায় ছিল না। ঈশ্বর জানেন, সে ভালোবাসা আমরা সকলেই পুরোপুরি দিয়েছিলাম তাকে। আমার ছেলেমেয়েরা তাকে পূজো করত! আর সে যদি সত্যিই দুর্বল চরিত্রের লোক হত তাহলে আমার স্ত্রীও তার কুকর্মের সঙ্গিনী হতে পারত অনায়াসে।

ছেলেমেয়েগুলোকে তো সে-ই প্রথম বাস্তব পৃথিবীর পথে পা ফেলতে শেখাল। প্রথম হাঁটতে শেখা থেকে শুরু করে সব শিক্ষাই তো তারা পেল ওটুর কাছে। ওদের অসুখ হলে সে পাশে বসে থেকে সেবা করত। এক এক করে ওরা যখন একটু বড় হল তখন ওটু ওদের নিয়ে চলল ঐ লেগুনের পারে। ওদের জলে নামতে শিখিয়ে রীতিমতো উভচর করে তুলল। মাছের জীবনযাত্রা প্রণালী আর মাছ ধরার কায়দাগুলো সে এমন করে ওদের শেখাল যে আমি কোনোদিনই ওসব জানতাম না। জঙ্গলেও একই ব্যাপার। সাত বছরের টম বনবিদ্যায় এমন পণ্ডিত হয়ে উঠবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। ছ'বছরের মেরি অকাতরে সেই খাড়া পাহাড়টার মাথায় উঠতে শিখল। আমি দেখেছি বলিষ্ঠ লোকেরাও সেই পাহাড়ে উঠতে হাজার বার দম নিত। আর ছোট্ট ফ্রান্কটা যখন ছ'বছরে পড়ল, আঠার ফুট জলের নিচে থেকে পয়সা কুড়িয়ে আনতে তার কোনোই কষ্ট হত না।

'বোরাবোরায় আমার স্বজনরা সবাই খ্রিস্টান। তারা আমার মত বিধর্মীকে দেখতে পারে না। আমিও বোরাবোরার খ্রিস্টানদের দেখতে পারি না।' একদিন আমার অনেক কথার উত্তরে সে এগুলো বলল। আমি চেয়েছিলাম তাকে দিয়ে কিছু টাকা খরচ করাতে। টাকাগুলো তো তারই। বলেছিলাম, আমাদেরই একটা জাহাজে করে সে একবার তার নিজের দ্বীপ থেকে ঘুরে আসুক। চেয়েছিলাম, ওর জন্যে একটা বিশেষ সমুদ্রযাত্রা হোক এবং অমিতব্যয়িতার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটা নজির হয়ে থাকুক।

জাহাজগুলো সে সময় আইনত আমার একার নামে থাকলেও আমি 'আমাদের জাহাজ' কথাটাই বলতাম। কী প্রচেষ্টাই না করেছি তাকে অংশীদার করার জন্যে।

শেষ পর্যন্ত একদিন ওটু বলল, 'পেটি জেন ডোবার পর থেকেই তো আমরা অংশীদার হয়ে গেছি। এর পরেও যদি তোমার মন চায় তাহলে ঠিক আছে, আইনসঙ্গতভাবেই আমি তোমার অংশীদার হব। দেখ, আমার কোনো কাজ নেই অথচ কত খরচ। মদ, পাইপ, খাওয়াদাওয়া এগুলোতে অনেক টাকা খরচ হয়। মাছ ধরা তো বড় লোকদের রীতিমতো শখের ব্যাপার। বড়শি আর সুতোর কী দাম! হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আমাদের আইনসঙ্গত ভাবেই অংশীদার হতে হবে। আমার যখন টাকা লাগবে, অফিসের হেড ক্লার্কের কাছ থেকে তা নেব।'

কাগজপত্র সব পাকাপাকি হয়ে গেল। কিন্তু এক বছর পরেই আমি অভিযোগ করতে বাধ্য হলাম। 'চার্লি, তুমি একটা পাজি ভণ্ড। এক নম্বরের কৃপণ।' আমি বললাম 'দেখ,

আমার অংশীদার হিসাবে এবছর তোমার লভ্যাংশ হয়েছে কয়েক হাজার ডলার। এই দেখ হেডক্লার্ক আমার কাছে হিসেব পাঠিয়েছে। এতে লেখা আছে যে তুমি সারা বছরে কোম্পানীর কাছ থেকে মাত্র সাতাশি ডলার বিশ সেন্ট নিয়েছ।'

'আরো পাব নাকি?' সে যেন উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল।

'আরে বললাম তো, হাজার ডলার।'

আমার কথা শুনে যেন মুক্তির আশ্বাসে মুখটা তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'তাহলে ভালোই হল। দেখছ তো, হেডক্লার্ক আমাদের কী কড়া হিসাবে রাখে। যখন আমার লাগবে তখন টাকা চাইবই। একটি সেন্ট হারালেও চলবে না। আর যদি হারায়, হেডক্লার্কের মাইনে থেকে আদায় করব।" মাঝখানে একটু দম নিয়ে বেশ জোরের সঙ্গেই শেষের কথাটুকু সে বলল।

পরে জানতে পারলাম ওটু আমার নামে তার সমস্ত সম্পত্তি উইল করে আমেরিকান কনসালের দায়িত্বে নিরাপদে রেখে দিয়েছে। ক্যাথুরাসদের দিয়ে সে নিজে উইল লিখিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু এবার সমাপ্তি ঘনিয়ে এল। সমস্ত মানবসম্পর্কের ক্ষেত্রেই একদিন সমাপ্তি ঘনিয়ে আসে। সেই সলোমন দ্বীপপুঞ্জে, যৌবনের দুর্বল দিনগুলোতে যেখানে বেপরোয়া সব কাজকর্ম করেছি, সেখানে আর একবার আমরা এলাম অবসর কাটাতে। অবশ্য সুযোগ করে নিয়ে ফ্লোরিডা দ্বীপে আমাদের জমিটা আর বলীগিরিবর্তে মুক্তো পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা তা দেখবার ইচ্ছাও ছিল। কিউরিয়ো সংগ্রহের আশায় আমরা সাভুতে অবস্থান করছিলাম।

সাভু হাঙরের লীলাক্ষেত্র। সংলগ্ন জলরাশির বিস্তারে তারা কেলি করে বেড়ায়। মৃতদেহের সৎকার করতে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী অসভ্যরা সেগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। এত বড় প্রলোভনও ওদের লীলাক্ষেত্র ছেড়ে আসতে উৎসাহিত করে না। আমার ভাগ্যই বলতে হবে। মাত্রাতিরিক্ত বোঝাই ছোট্ট একটা দেশি ডিঙ্গায় করে আসছিলাম। ডিঙাটা উল্টে গেল। আমি ছাড়াও তাতে বারজন কোঁকড়া চুলঅলা নেটিভ ছিল। আমরা ডিঙাটা ধরে ঝুলছিলাম। জাহাজটা তখনো একশ গজ দূরে। একটা নৌকা পাঠানোর জন্যে ডাকাডাকি শুরু করলাম আর তখনই একটা নেটিভ আর্তনাদ করে উঠল। ডিঙার যে প্রান্তটা সে আঁকড়ে ধরেছে সে দিকটা সমেত কী যেন তাকে বার বার নিচের দিকে টানছে তার হাতটা অবশ হয়ে গেল। সে জলের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটি হাঙর তাকে নিয়ে গেছে।

বাকি তিনজন নেটিভ জলের মধ্যে থেকে ডিঙার তলার ওপরে উঠে আসতে চাইল। আমি চেঁচিয়ে নিষেধ করলাম, গাল দিলাম, সবচেয়ে কাছে যে ছিল তাকে একটা ঘুষিও বসিয়ে দিলাম। কিন্তু তাই কি শোনে। তখন ওরা আতঙ্কে অন্ধ হয়ে গেছে। ডিঙাটা কোনো মতে ওদের একজনের ভার সইতে পারত। কিন্তু তিনজনের ভারে কাত হয়ে ঘুরে গেল আর ওরা জলেই ছিটকে পড়ল আবার।

আমি ডিঙাটা ছেড়ে দিয়ে জাহাজের দিকে সাঁতরাতে লাগলাম। ভাবলাম ইতিমধ্যেই নৌকাটা এসে আমাকে উদ্ধার করে নেবে। নেটিভদের একজন আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছিল। আমরা বার বার জলের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে হাঙর দেখতে দেখতে, নীরবে, পাশাপাশি সাঁতরাতে লাগলাম। ডিঙাটার পাশে যে লোকটা ছিল তার আর্তনাদ শুনে বুঝলাম তাকেও হাঙর পেয়েছে। জলের মধ্যে তাকিয়েছিলাম; দেখলাম একটা বিরাট

হাঙর আমার নিচ দিয়ে চলে গেল। সম্পূর্ণটাই দেখলাম। পুরোপুরি ষোল ফুট লম্বা হবে হাঙরটা। আমার পাশের নেটিভটার পেট আর কোমর কামড়ে ধরল সেটা। তারপর তাকে দূরে নিয়ে চলল। যেতে যেতে হতভাগা বেচারা হাত, মাথা, কাঁধ, জলের ওপরে ছুঁড়তে ছুঁড়তে হৃদয়বিদারী চীৎকার করতে লাগল। কয়েকশ ফুট তাকে এভাবে নিয়ে গিয়ে জলের নিচে টেনে নিল হাঙরটা।

ঐটাকেই শেষ যূথভ্রষ্ট হাঙর মনে করে আমি প্রাণপণ সাঁতরাতে লাগলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আরেকটা এল। জানি না, এটাই সেই হাঙর কিনা যেটা কিছুক্ষণ আগে ঐ নেটিভদের আক্রমণ করেছিল, নাকি অন্য কোনোখান থেকে ভক্ষণ সেরে আসা আরেকটা হাঙর। যেটাই হোক, অন্যগুলোর মতো অত ক্ষিপ্র নয় এটা। আমি আগের মতো জোরে সাঁতার কাটতে পারছি না। উদ্যমের অধিকাংশ দিয়ে হাঙরটার গতিবিধি লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে। সে যখন আমাকে প্রথম আক্রমণ করল আমি তখন তার ওপর নজর রেখে চলেছিলাম। ভাগ্যক্রমে দুহাতে তার নাক চেপে ধরলাম। তাই তার ভরে তলিয়ে যেতে যেতেও তাকে তফাৎ রাখতে সক্ষম হলাম। পরিষ্কার দেখলাম ও ঘুরে এল এবং চারপাশে ঘুরতে লাগল। দ্বিতীয়বার একই কৌশলে তাকে এড়িয়ে গেলাম। তৃতীয়বারের আক্রমণটা উভয়ের কারণেই ফসকে গেল। আমার হাত তার নাকের ওপর পড়তেই সে সরে গিয়েছিল। কিন্তু তখন শিরিষ কাগজের মতো তার খরখরে চামড়ার ঘর্ষণে কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত আমার হাতের চামড়া (আমার গায়ে তখন হাতাছাড়া একটা গেঞ্জি মাত্র) একেবারে উঠে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে আমি সম্পূর্ণ কাহিল হয়ে পড়েছিলাম। সব আশা ছেড়ে দিলাম। জাহাজটা তখন দুশো ফুট দূরে। আমি জলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে লক্ষ্য করছিলাম হাঙরটা আরেকটা আক্রমণের কৌশল আঁটছে। এমন সময় একটা পিঙ্গল বর্ণ শরীর আমাদের মাঝখানে ভেসে এল। সে আর কেউ নয়, ওটু।

'জাহাজের দিকে সাঁতরে যাও, মাস্টার।' সে এমনভাবে বলল যেন ব্যাপারটা একটা তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়, 'হাঙরের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, ওরা আমার ভাই।'

তার কথামতো আস্তে আস্তে সাঁতরে চললাম। নিজেকে আমার আর হাঙরের মাঝখানে রেখে ওটুও সাঁতরাতে লাগল। এবং বার বার হাঙরটার আক্রমণ বিফল করে দিয়ে আমাকে উৎসাহ দিয়ে চলল।

মিনিট খানেক পরেই ওটু আমাকে বুঝিয়ে বলল, 'ডিঙি নামানোর মাচনটা সরিয়ে নিয়ে জাহাজ থেকে ওরা দড়ির সিঁড়ি নামিয়ে দিচ্ছে।' তারপর সে আরেকটা আক্রমণ প্রতিহত করতে ডুব দিল।

প্রায় এসে গেছি। জাহাজটা আর মাত্র ত্রিশ ফুট দূরে। কিন্তু আমি যেন আর নড়তে পারছিলাম না। ওরা জাহাজ থেকে আমাদের দিকে রশি নিক্ষেপ করছে কিন্তু প্রতিবারই তা আমার নাগালের বাইরে যাচ্ছে। ওদিকে হাঙরটা তেমন কোনো আঘাত না পেয়ে আরো দুর্ধর্ষ হয়ে উঠছে। বহুবার সে আমাকে ধরবার উপক্রম করল কিন্তু প্রতিবারই বিপর্যয়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ওটু এসে আমাকে বাঁচাল। আত্মরক্ষার সকল সুযোগ উপেক্ষা করে ওটু আমাকেই আগলে রাখল।

'বিদায় চার্লি, আর পারলাম না।' অতিকষ্টে উচ্চারণ করলাম।

বুঝতে পারলাম আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। এক্ষুনি হয়ত হাত-পা ছেড়ে তলিয়ে যাব।

কিন্তু ওটু আমার চোখের দিকে চেয়ে হেসে বলল, "তোমাকে একটা নতুন খেলা দেখাব, হাঙরটাকে আমি বিতৃষ্ণ করে দিচ্ছি।"

সে আমার পেছন দিকে সরে গেল। হাঙরটা সেখান থেকেই আমাকে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

'আরেকটু বাঁদিকে যাও। জলের ওপরে একটা রশি ভাসছে বাঁয়ে, মাস্টার, আরেকটু বাঁয়ে।' পরক্ষণেই সে আবার বলে উঠল।

আমি দিক পরিবর্তিত করে অন্ধের মতো হাতড়াতে লাগলাম। আমার সমস্ত চেতনা তখন লুপ্তপ্রায়। দড়িটা আমার হাতে ঠেকতেই জাহাজ থেকে ওদের উল্লাস কানে এল। আমি পেছন ফিরে তাকালাম। ওটুকে পেলাম না। পরক্ষণেই সে ভেসে উঠল। দুটো হাতই কব্জি থেকে কাটা। কাটা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে।

'ওটু!' সে কোমল আন্তরিক সুরে ডাকল।

তার কম্পিত কণ্ঠস্বরে যে আন্তরিক ভালোবাসা ধ্বনিত হল, তার দৃষ্টিতেও দেখলাম তারই প্রতিফলন। এখন, কেবল এখনই, আমাদের দীর্ঘ সঙ্গীজীবনের এই অন্তিম মুহূর্তে সে আমাকে এ নামে ডাকল।

তার কণ্ঠে শেষবার উচ্চারিত হল, "বিদায়, ওটু!'

সঙ্গে সঙ্গে একটা হ্যাঁচকা টানে সে নিচে তলিয়ে গেল। আমাকে টেনে তুলল ওরা জাহাজের ওপরে। ক্যাপ্টেনের হাতের ওপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

এমনিভাবে বিদায় নিল ওটু সে আমাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তুলেছিল; শেষ মুহূর্তে সে-ই আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে গেল। ঝড়ের গর্ভে যাকে পেয়েছিলাম, হাঙরের গর্ভে তাকে হারালাম। নিরবচ্ছিন্ন বন্ধুত্বের সতেরটি বছর আমরা একত্রে অতিবাহিত করেছি। একজন শ্বেতাঙ্গ আর একজন পিঙ্গল বর্ণ মানুষের মধ্যে এমন নিবিড় বন্ধুত্ব হয়ত পৃথিবীর আর কোনো দুটি মানুষের জীবনেই সম্ভব হয় নি। ঈশ্বর যদিও তাঁর উচ্চাসন থেকে জীবজগতের সামান্য কুটাটির পতনও লক্ষ্য করে থাকেন তবু তাঁর রাজ্যে বোরাবোরা দ্বীপের এই বিধর্মী ওটু বুঝি বিদায় নিল সকল লক্ষ্যের অগোচরে।

আগুন জ্বালতে হলে

দুর্জয় একটি শীতের সকাল। দিনের আলো ফুটেছে কিন্তু চারধার এখনো মোলাটে। লোকটি এতক্ষণ ইউকন নদীর তীর বরাবর পায়ে হাঁটা পথটা ধরে এগোচ্ছিল। এবার নদীর তীর ছেড়ে খাড়া চড়াই বেয়ে উঠে আসে পাড়ের ওপর। দেবদারু বনের মাঝ দিয়ে পূর্ব দিকে চলে গেছে সরু একটা পায়ে হাঁটা পথ। পথটিতে মানুষের পায়ের চিহ্ন খুব কমই পড়েছে বোধহয়। চড়াই ভেঙে সমতলে উঠে হাঁপিয়ে পড়ে লোকটি। দম নিতে একটু দাঁড়ায়, নিজের দুর্বলতাকে সে নিজের কাছেও ব্যক্ত করতে নারাজ। এমনভাবে ঘড়ির দিকে দৃষ্টি ফেরায় যেন কটা বেজেছে দেখার জন্যেই থামা। বেলা কম হয় নি, নটা বাজে। আকাশের বুকে একটুও মেঘ জমে নি, তবু সূর্যের দেখা নেই, কোনো লক্ষণই নেই দেখা দেবার। মেঘমুক্ত দিনটির ওপর যেন বিষণ্ণতা তার ওড়না বিছিয়ে রেখেছে। প্রতিটি বস্তুকে ঘিরে রয়েছে একটা মলিন ধূসরতা। সূর্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে নি বলেই এরকম লাগছে। অবশ্য লোকটি তার জন্যে বিন্দুমাত্রও চিন্তিত নয়। কেননা সূর্যহারা দিনের সঙ্গে ওর দীর্ঘদিনের পরিচয়। পরপর বেশ কয়েক দিন সূর্য ওঠে নি এবং আরো কয়েক দিন উঠবেও না, তারপর হঠাৎ একদিন দক্ষিণ আকাশে একটি রক্তিম পিণ্ড মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়েই আবার দিগন্তপারে মুখ লুকাবে।

লোকটি পিছনে ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল। মাইলখানেক চওড়া ইউকন নদীর ওপর তিন ফুট বরফের কঠিন আস্তরণ তার ওপর আবার তিন ফুট উঁচু তুষারপুঞ্জ অমলিন শুভ্রতার বুকের ওপর ছোট ছোট ঢেউ-এর মতো বিছিয়ে আছে। উত্তর কি দক্ষিণ যে দিকে তাকানো যাক শুধু অবিচ্ছিন্ন তুষারের আবরণ আর তার মধ্যে চুলের মতো একটি রেখা এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। এইটিই প্রধান সড়ক। আর এই সড়কের ওপরেই লোকটি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তুষার সমুদ্রের মধ্যে যেন দ্বীপের মতো নিঃসঙ্গ এই দেবদারু বনভূমি। সুদূর উত্তরে অবশ্য আরেকটি দেবদারু গাছের দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। পথরেখাটি লুপ্ত হয়েছে ওখানেই। পথটির দক্ষিণমুখী দৈর্ঘ্য পাঁচশ মাইল। চিলকুট পাশ, ডাইয়া হয়ে সমুদ্রে গিয়ে শেষ হয়েছে। উত্তরে এগোলে হাজার মাইল পার করে পথটি এসে পড়েছে নুলাটোয়। নুলাটো ছেড়ে আরো হাজার মাইল পেরিয়ে পথটি বেরিঙ সাগরের কূলে সেন্ট মাইকেলে এসে শেষ হয়েছে।

চুলের মতো সরু এক ফালি এই রহস্যময় পথ, সূর্যহীন আকাশ, তীব্র শীত বা বিচিত্র কতকগুলো পরিস্থিতির সমাবেশ—কোনোটাই লোকটির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। লোকটি যে দীর্ঘকাল এ জীবনে অভ্যস্ত তাও নয়। বলতে গেলে সে সম্প্রতিই এসেছে। এ অঞ্চলের শীতকালের সঙ্গে এই-ই তার প্রথম পরিচয়। মুস্কিল বেধেছে লোকটির চিন্তাশক্তি অত্যন্ত কম বলেই। জীবনে যাই ঘটুক না কেন সে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, কিন্তু তার ভবিষ্যৎ ফলাফল কী হবে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা করতে পারে না। মাইনাস পঞ্চাশ ডিগ্রি মানেই হিমাঙ্কের নিচে আশি ডিগ্রি পরিমাণ তুষার। এই অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপারটার গুরুত্ব বলতে সে বোঝে শুধু ঠাণ্ডায় খানিকটা অস্বস্তি বোধ করা। আর কিচ্ছু না। সে একবারও ভাবে না যে মানুষ চিরঞ্জয়ী নয়, শীত ও

গ্রীষ্মের একটা নির্ধারিত মাত্রার মধ্যেই তার পক্ষে জীবন ধারণ করা সম্ভব। সে কোনোদিনই মানুষের নশ্বর দেহের কথা ভাববে না, মহাবিশ্বে মানুষের স্থান কোথায় তাই নিয়ে চিন্তিতও হয়ে পড়বে না। তাপমাত্রা শূন্য ছাড়িয়ে পঞ্চাশ ডিগ্রি নিচে নামা মানে তার কাছে হাড় কাঁপানো শীতে কষ্ট পাওয়া আর তাই তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পশমি দস্তানা, কানঢাকা টুপি, গরম জুতো আর মোটা মোজা পরা। মাইনাস পঞ্চাশ ডিগ্রি মানে তার কাছে মাইনাস পঞ্চাশ ডিগ্রি। এ ছাড়াও যে এর আর কোনো অর্থ থাকতে পারে সেটা তার মগজে কোনোদিনই ঢুকবে না।

যাত্রা শুরু করার আগে কী ভেবে লোকটা হঠাৎ থুতু ফেলে। অমনি পটকা ফাটার মতো একটা তীক্ষ্ম শব্দ হয়। লোকটি আবার থুতু ছেটায়। আবার পটকা ফাটার শব্দ। লোকটি অবাক হয়ে ভাবে হিমাঙ্কের পঞ্চাশ ডিগ্রি নিচে তুষারের সংস্পর্শে এলে থুতু এরকম শব্দ করে ফাটে কিন্তু এখন তো তুষার স্পর্শ করারও প্রয়োজন হচ্ছে না! বাতাসেই বিস্ফোরণ ঘটছে। তার মানে পায়ের নিচে তাপমাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রিরও কম। অবশ্য কতটা কম তা জানার উপায় নেই, আর তা নিয়ে ওর চিন্তাও নেই। এখন ওর হেন্ডারসন খাঁড়ির বাঁ ফালিতে অবস্থিত খনি অঞ্চলটায় পৌছানো দরকার। দলের বাকি লোকেরা ইতিমধ্যেই সেখানে হাজির হয়েছে। ওরা ইন্ডিয়ান ক্রিক প্রদেশ থেকে জলভাগ পেরিয়ে এসেছে আর চলেছে একটু ঘুরপথে। ইউকন দ্বীপ থেকে বসন্তকালে গাছের গুঁড়ি সরবরাহ করা যাবে কিনা খোঁজ নেবার জন্যই এই পথে ওর আগমন। ছটার মধ্যেই শিবিরে পৌছে যাবে নিশ্চয়। ততক্ষণে অন্ধকার নেমে আসবে ঠিকই কিন্তু শিবিরে পৌছে গেলে আর দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। ততক্ষণে ওরা আগুন জ্বেলে ফেলবে। রাতের খাবারও তৈরি থাকবে। আর দুপুরের খাওয়া—কথাটা মনে পড়তেই ও পেটফোলা জ্যাকেটের ওপর হাত ঠেকায়। জ্যাকেট আর শার্টের তলায় একেবারে গায়ের চামড়া স্পর্শ করে আছে একটা পুঁটলি। রুমাল দিয়ে জড়ানো বিস্কুটগুলো যাতে জমে না যায় তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। বিস্কুটের কথা মনে পড়তেই লোকটির মুখে ঈষৎ হাসির আভাষ দেখা দেয়। শুয়োরের চর্বি মাখানো বিস্কুটগুলো টুকরো করে কাটা আছে আর টুকরোগুলোর মাঝে আছে শুয়োরের মাংসের পুরু পুরু ফালি।

লোকটা এবার দেবদারু গাছের ফাঁক দিয়ে এগোতে শুরু করে। শেষ স্লেজ গাড়িটা পেরিয়ে যাবার পর কম করে অন্তত এক ফুট তুষারপাত হয়েছে। লোকটি ভাবে ভাগ্য তার ভালো যে সঙ্গে স্লেজ গাড়ি নেই। মালপত্র থাকলে এখন দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। সত্যি বলতে কি তার কাছে ওই খাবারের পুঁটলিটা ছাড়া আর কিছুই নেই। ও কিন্তু শীতের প্রকোপ দেখে বিস্মিত হয়। অবশ নাক আর গালের ওপর দস্তানা পরা হাতটা বোলায়। সত্যিই দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছে আজকে। মুখভর্তি দাড়ি থাকা সত্ত্বেও গালদুটো একেবারে হিম হয়ে গেছে। নাকের ডগাটারও অবস্থা একই। যা উঁচু নাকটা, শীতল বাতাসের মধ্যে একেবারে যেন গুঁজে রয়েছে।

লোকটির পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে একটা ধূসর বর্ণ লোমওলা কুকুর। বুনো নেকড়ের একেবারে সাক্ষাৎ জ্ঞাত ভাই। যেমন মেজাজ তেমনি তার চেহারা। কুকুরটাও ঠাণ্ডার চোটে কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। ও জানে এটা পথ চলার উপযুক্ত সময় নয় ইন্দ্রিয়-নির্ভর কুকুরটির বিশ্লেষণ দেখা যাচ্ছে বিচারক্ষম মানুষটির চেয়ে অনেক বেশি নির্ভুল। আসলে তাপমাত্রা এখন হিমাঙ্কের নিচে পঞ্চাশ ডিগ্রি নয়, ষাট ডিগ্রি নয়, এমন কি সত্তর ডিগ্রিও নয়। হিমাঙ্কের নিচে পঁচাত্তর ডিগ্রি। শূন্যের ওপর বত্রিশ ডিগ্রিতে হচ্ছে হিমাঙ্ক, তাই এখন

যা তাপমাত্রা তাতে একশ ডিগ্রি সমান তুষারপাত হয়েছে। কুকুরটা থার্মোমিটার সম্বন্ধে অজ্ঞ। মানুষের মতো, 'খুব ঠাণ্ডা' বলে একটা অবস্থাকে শনাক্ত করার মতো ক্ষমতা সম্ভবত কুকুরের মস্তিষ্কের নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সহজাত প্রবৃত্তি বলে একটা জিনিস আছে। কুকুরটাও তাই একটা অস্পষ্ট অথচ ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার আশঙ্কায় কেমন জবুথবু হয়ে পড়েছে। লোকটির একেবারে পায়ে পায়ে জড়িয়ে রয়েছে। যেন প্রতি পদক্ষেপেই সে মানুষটিকে প্রশ্ন করছে, কী প্রয়োজন এদিকে যাবার? চলো, সোজা ক্যাম্পে ফিরে যাই! নয়ত একটা আস্তানার সন্ধান কর। একটা আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে বসা যাক!

কুকুরটার নিশ্বাসের সঙ্গে নির্গত জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে কণা কণা তুষার হয়ে তার গায়ের লোমের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে! বিশেষ করে ঠোঁট, নাক আর চোখের পাতা একেবারে সাদা হয়ে উঠেছে। তবে কুকুরটির চেয়েও আরো বেশি পরিমাণে এবং আরো ঘন হয়ে তুষার জমেছে লোকটির লাল দাড়ি আর গোঁফের ওপর। এক এক বার উষ্ণ নিশ্বাস পড়ছে, সেই সঙ্গে জমাট বরফের পরিমাণও আরো বাড়ছে। লোকটি খৈনি চেবাচ্ছে কিন্তু ঠোঁটের চারপাশে বরফ থাকার দরুন ভালোভাবে হাঁ করে পিক ফেলতে পারছে না। ফলে পিকটা চিবুক দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে আর সঙ্গে সঙ্গেই জমাট বেঁধে খয়েরি রঙের একটা স্ফটিকের দাড়ির উত্তরোত্তর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করছে। হঠাৎ ও যদি পড়ে যায় ভঙ্গুর কাঁচের মতো ওই দাড়িটিও গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়বে। তবে এই অভিনব অঙ্গ-সংযোজন নিয়ে লোকটি মোটেই চিন্তিত নয়। এ অঞ্চলে যাদের খৈনির নেশা আছে তাদের প্রত্যেককেই এই খেসারতটি দিতে হয়।

বেশ কয়েক মাইল সমতল বনভূমি পেরিয়ে, একটি ছোট্ট নদীর পাড় ডিঙিয়ে লোকটি তুষারপূর্ণ নদীর বুকে পা রাখে। এটাই হেন্ডারসন খাঁড়ি। আর দশ মাইল এগোলেই এই খাঁড়ির দ্বিধাবিভক্ত মুখটির কাছে পৌঁছানো যাবে। এখন দশটা বাজে। ঘণ্টায় ও চার মাইল করে এগোচ্ছে। কাজেই খাঁড়ির মুখটার কাছে পৌঁছতে বেলা সাড়ে বারোটা হবে। লোকটি ভাবে দুপুরের ভোজন পর্বটা ও ওখানে পৌঁছেই সারবে।

বরফ জমা নদীর ওপর নামতেই কুকুরটাও তাকে অনুসরণ করল। লেজটা প্রায় পেটের মধ্যে গুটিয়ে রেখেছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে কুকুরটা হতাশ হয়েছে। স্লেজ চলার দাগ স্পষ্ট চোখে পড়ছে এখনো কিন্তু স্লেজের সহযাত্রীদের পদচিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে প্রায় ফুট খানেক তুষারের তলায়। গত এক মাসের মধ্যে এ অঞ্চলে কারোর পায়ের ছাপ পড়ে নি। নীরবে লোকটি এগিয়ে চলে। চিন্তা ব্যাপারটা ওর আদৌ আসে না। এই মুহূর্তে ওর মাথায় আছে শুধু দুপুরের ভোজন সাঙ্গ করার আর তারপর ক্যাম্পে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার চিন্তা। সঙ্গে একজনও লোক নেই যে কথা বলবে। তবে কথা বলার লোক থাকলেও সে কথা বলতে পারত না। ঠোঁটের দুধারে জমে আছে বরফ। লোকটি শুধু একটানা খৈনি চিবিয়ে যাচ্ছে আর তার স্ফটিকের দাড়ি ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

এর মধ্যে এক আধবার ওর মনে হয়েছে যে ঠাণ্ডাটা সত্যিই আজ খুব বেশি পড়েছে। এরকম অভিজ্ঞতা এই প্রথম। হাঁটতে হাঁটতেই বার বার সে দস্তানা পরা হাতের তালু দিয়ে একবার গাল ঘসে আর একবার নাক। প্রায় যন্ত্রচালিতের মতো আপনা থেকেই একবার বাঁ হাত আর একবার ডান হাত ব্যবহার করে। কিন্তু যতই ঘষুক হাত সরালেই দেখে নাক আর গাল সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডায় আবার অবশ হয়ে যাচ্ছে। গালে তুষারক্ষত হবার নিশ্চিত সম্ভাবনা লোকটি বুঝতে পারে। মনে মনে অনুশোচনা হয় বাডের কথা মতো নাক ঢাকার একটা ব্যবস্থা করে নি বলে। ফিতে লাগানো নাক ঢাকার ব্যবস্থাটা থাকলে গাল দুটোতেও

আর তুষার ক্ষত হত না। কিন্তু এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করার তেমন কোনো কারণ নেই। গালে তুষার-ক্ষত হলেই বা কী? বড়জোর একটু যন্ত্রণা পেতে হবে। তেমন বিপজ্জনক কিছু ঘটার আশঙ্কা নেই।

লোকটির মাথায় কোনো চিন্তা না থাকলেও তার দৃষ্টি কিন্তু অত্যন্ত সজাগ। খাঁড়ির আঁকাবাঁকা গতিপথ আর আটকে থাকা গাছের গুঁড়ির দিকে সতর্ক চোখ রেখে তবেই সে পদক্ষেপ করছে। একটা বাঁক পেরিয়ে প্রথম পা ফেলেই সে হঠাৎ যেন বিস্ময়ে চেঁচিয়ে ওঠে। নিমেষের মধ্যে পা সরিয়ে নেয় এক পাশে। তারপর পিছিয়ে আসে কয়েক পা। ও জানে খাঁড়ির জল তলা অবধি সম্পূর্ণ জমে আছে। শীতকালে কোনো খাঁড়িতেই জল থাকা সম্ভব না হলেও এসব অঞ্চলে এমন অনেক পাহাড়ি ঝরণা আছে যার জল ওই বরফ জমা খাঁড়ির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় কিন্তু ঝরা তুষারের আড়ালে থাকে বলে ওপর থেকে কিছু বোঝা যায় না। যতই ঠাণ্ডা পড়ুক এইসব ঝরণার জল কিন্তু জমে না। এগুলো এক একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক ফাঁদ। কখনো কখনো আধ ইঞ্চি পুরু বরফের তলায়ও আত্মগোপন করে থাকে জলের কুণ্ড। বরফের ওপর আবার পড়ে থাকে তুষারের আস্তরণ। কখনো কখনো পরপর বেশ কয়েক স্তর জল আর বরফ এইভাবে লুকিয়ে থাকে। একবার যদি সেখানে পা পড়ে, একের পর এক বরফের পর্দা ভেঙে এক কোমর জলের মধ্যেও তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

ভীত হয়ে পিছিয়ে আসার কারণ এইটাই। স্পষ্ট টের পেয়েছে পায়ের চাপে মড়মড় করে উঠেছে এমনি একটা পাতলা বরফের পর্দা। তুষারে ঢাকা আছে তাই কিছুই বুঝতে পারে নি। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পা ভিজে যাওয়া মানেই হাঙ্গামা আর বিপদ। আর কিছু যদি নাও হয় যাত্রায় বিলম্ব তো হবেই। প্রথমেই একটা আগুন জ্বালতে হবে, তারপর সেই আগুনের সামনে পা রেখে জুতো মোজা খুলে সেগুলো শুকিয়ে নিতে হবে। এক জায়গায় দাঁড়িয়েই খাঁড়ির পৃষ্ঠদেশ আর পাড়গুলো খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে লোকটি। শেষ পর্যন্ত স্থির করে যে জলস্রোতটি এসেছে তার ডান দিক থেকে। নাক আর গাল ঘষতে ঘষতে খানিকক্ষণ চিন্তা করে অবশেষে বেজার মুখে সে বাঁদিক ঘেঁষে চলতে শুরু করে। প্রতিটি পদক্ষেপের আগে আলতো করে একবার পা ছুঁইয়ে দেখে নিচ্ছে। বিপদসীমা অতিক্রম করে লোকটি আবার মুখে খৈনি পোরে। এতক্ষণে সে আবার আগের মতো ঘণ্টা পিছু চার মাইল বেগে হাঁটতে শুরু করে।

পরবর্তী দুঘণ্টার মধ্যে লোকটি বেশ কয়েকবার এরকম ফাঁদের সম্মুখীন হয়েছে। এর মধ্যে একবার অবশ্য ও অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। হঠাৎ সন্দেহ হওয়ায় একটা জায়গায় ও কুকুরটাকে আগে ঠেলে দিয়েছিল। কুকুরটা প্রথমটায় যেতে চায় নি। শেষ পর্যন্ত তাড়া খেয়ে নিরুপায় হয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। সাদা বরফের ওপর ক'পা না এগোতেই হঠাৎ বরফ ভেঙে প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছিল কুকুরটা। কোনোরকমে সামলে নিয়ে সরে এসেছে। ততক্ষণে কিন্তু তার সামনের পা দুটো হিমশীতল জলে ভিজে গেছে। জল থেকে পা বের করা মাত্র পায়ে যেটুকু জল লেগেছিল তা বরফ হয়ে জমে যায়। বরফ-মুক্ত হবার জন্যে কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে পা চাটতে শুরু করে। তারপর তুষারের ওপর বসে দাঁত দিয়ে কামড়ে কামড়ে পায়ের আঙুলের ফাঁকে জমা বরফ কাটতে শুরু করে। এটা একটা প্রবৃত্তিগত ব্যাপার। বরফটা থাকলে যে পায়ে ক্ষত সৃষ্টি হবে এ কথা কুকুরটা জানে না, তবু তার প্রাণীসত্তার গভীরে জাত এক রহস্যময় নির্দেশকে সে মান্য করে। লোকটি কিন্তু ব্যাপারটা জানে বলেই ডান হাতের দস্তানা খুলে কুকুরটার আঙুলের ফাঁক থেকে বরফের কুচিগুলো

সরিয়ে দেয়। দস্তানাটা আবার পরে নিতে মিনিট খানেকের বেশি লাগে নি কিন্তু লোকটি অবাক হয়ে দেখে ইতিমধ্যেই আঙুলগুলো অবশ হয়ে গেছে। সত্যিই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আজ। তাড়াতাড়ি দস্তানাটা গলিয়ে নিয়ে বুকের ওপর সজোরে একটা থাপ্পড় কষায় অবশ ডান হাতটা দিয়ে।

ঠিক বারোটার সময় আকাশের উজ্জ্বলতা সবচেয়ে বেশি হয় কিন্তু সূর্য তার শীতকালীন সফরের পথে এখন সুদূর দক্ষিণে পৌঁছে গেছে তাই দিগন্ত আর উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না। সূর্য আর হেন্ডারসন খাঁড়ির মাঝখানে পৃথিবীর ফুলো পেটটা একটা অবরোধ সৃষ্টি করেছে। মাঝ দুপুরে মেঘমুক্ত আকাশের নিচে হেঁটে চলেছে লোকটি কিন্তু মাটিতে তার ছায়ার রেশও পড়ছে না। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে বারোটার সময় লোকটি হেন্ডারসন খাঁড়ির দ্বিধাবিভক্ত মুখটায় এসে পৌঁছল। নিজের হাঁটার গতি দেখে নিজেই খুব সন্তুষ্ট। এভাবে হাঁটতে পারলে ছ টার মধ্যেই নিশ্চয় দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে। জ্যাকেট আর জামার বোতাম খুলে দুপুরের খাবারটা বের করে আনে। সেকেন্ড পনেরর বেশি সময় লাগে নি কাজটি সারতে কিন্তু তারই মধ্যে উন্মুক্ত আঙুলগুলো অবশতার শিকার হয়েছে। দস্তানাটা না পরে প্রায় বার বার হাতটা সে সজোরে থাবড়ায় ডান পায়ের ওপরে। তারপর তুষার জমা একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে পড়ে খাবে বলে। পায়ে থাপ্পড় মারার জন্যে যে শিরশিরে ব্যথাটা প্রথমে অনুভব করেছিল দেখতে দেখতে সেটা কেটে ওঠে। এত দ্রুত আঙুলগুলোকে আবার অবশ হতে দেখে চমকে যায় লোকটি। বিস্কুটে একটা কামড় বসাবারও সুযোগ মেলে নি। ডান হাতের আঙুলগুলো দিয়ে আবার বার কয়েক থাপ্পড় কষিয়ে দস্তানাটা এবার গলিয়ে নেয়। এবার বাঁ হাতের দস্তানাটা খুলেছে খাবে বলে। কিন্তু বিস্কুট মুখে পোরা গেল না। তার বরফজমা ঠোঁট ফাঁক হল না। আগেই আগুন জ্বেলে গায়ের বরফ গলিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই লজ্জা পায় লোকটি। ইতিমধ্যে বাঁ হাতের আঙুলগুলো অসাড় হতে শুরু করেছে। লোকটি আরো অনুভব করে যে গাছের গুঁড়িটার ওপরে চড়ে বসবার সময় পায়ের আঙুলগুলো ঢিনচিন করে উঠেছিল কিন্তু এখন আর করছে না। তাহলে কি পায়ের আঙুলগুলোও অসাড় হয়ে গেল! পরীক্ষামূলকভাবে মোকাসিনের মধ্যে আঙুল নাড়িয়ে দেখল সত্যিই অবশ হয়ে গেছে ওগুলো।

দ্রুত দস্তানা পরে উঠে দাঁড়ায় সে। আতঙ্ক স্পর্শ করেছে ওকে। জোরে জোরে মাটির ওপর পা ঠুকতে শুরু করে দেয়। শেষ পর্যন্ত ব্যথার অনুভূতি ফিরে আসে। লোকটি ভাবে সত্যিই এমন ঠাণ্ডা সচরাচর দেখা যায় না। সালফার খাঁড়ির ওখানে সেই লোকটা ঠিকই বলেছিল। এ অঞ্চলের শীতের প্রকোপ মাঝে মধ্যে এমনি দুঃসহ হয়ে ওঠে। তখন লোকটার কথা ও হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল। এর থেকেই বোঝা যায় সব বিষয়ে নিজের খুশিমতো সিদ্ধান্ত নেওয়াটা অনুচিত। আজকের শীতলতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। লোকটি আগু পিছু ছোটাছুটি শুরু করে দেয়, মাটিতে পা ঠোকে জোরে জোরে, হাত দিয়ে অনবরত চাপড় মারে। শেষ পর্যন্ত অনুভূতি ফিরে এসেছে বুকে নিশ্চিন্ত হয়ে আগুন জ্বালাতে দেশলাই বের করে। গত বছর বসন্তের সময় জোয়ারের জলে ভেসে আসা ডালপালা কাছেই এক জায়গায় জমা হয়েছিল। সেখান থেকেই ও আগুন জ্বালার কাঠ পেয়ে যায়। দু'একটা গাছের ডালে আগুন ধরিয়ে নেয় প্রথমে, তারপরে সেটা গনগনে আগুনের এক চুল্লিতে পরিণত হয়। আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে মুখের ওপর জমা বরফ গলিয়ে নেয়, তারপর সারে দুপুরের বিস্কুট খাওয়া। কিছুক্ষণের জন্য শীতলতা পরাস্ত হয়। কুকুরটাও সন্তুষ্ট মনে যতদূর সম্ভব আগুনের ধার ঘেঁষে পা ছড়িয়ে বসে।

খাওয়া শেষ করে পাইপে তামাক ভরে বেশ আমেজের সঙ্গে ধূমপানের পর্ব সাঙ্গ করে উঠে দাঁড়ায় লোকটি। দস্তানা দুটো খুলে কানঢাকা টুপিটাকে বেশ ভালো করে টেনে দেয় দু কানের ওপর, আবার শুরু হয় হাঁটা। কুকুরটা হতাশ হয়ে বারবার সতৃষ্ণ নয়নে পিছন ফিরে ফিরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকাচ্ছে। এই লোকটির শীত সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই। হয়ত তার বংশের কেউ কোনোদিন প্রচণ্ড শীতের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নি। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের একশো সাত ডিগ্রি নিচে এই কথাটার অর্থ বোঝার সুযোগ পায় নি নিশ্চয়। কুকুরটা কিন্তু এর অর্থ বোঝে, তার পূর্বপুরুষরাও সবাই বুঝত। তাই এই জ্ঞান সে উত্তরাধিকার সূত্রে আহরণ করেছে। কুকুরটা স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে এই ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায় পথচলার কোনো মানেই হয় না। এখন তুষারের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে চুপটি করে তার মধ্যে ঢুকে বসে থাকার কথা। তারপর আকাশে মেঘ ঘনালে বায়ু প্রবাহিত শীতের প্রকোপ যখন কমে আসবে তখন আবার শুরু করা উচিত পদযাত্রা। কিন্তু কুকুর আর লোকটির মধ্যে কোনো সদ্ভাব নেই। কুকুরটি ওর ক্রীতদাস। যা বলা হয় ওকে তাই করতে হয় আর আদর বলতে জোটে শুধু চাবুকের ঘা আর কর্কশ কণ্ঠের শাসানি। এই জন্যেই কুকুরটি তার চিন্তার কথা মানুষটির কাছে প্রকাশ করার কোনো সুযোগই পায় না। শুধু মানুষটির মঙ্গলের কথা ভেবে ও পিছন ফিরে অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকায় নি। তাকিয়েছিল নিজের আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই। লোকটি কিন্তু সেদিকে কোনো আমল না দিয়েই শিস দিয়ে আর হিসহিস শব্দে চাবুক মারার মতো করে ওকে শাসিয়ে ওঠে। কুকুরটি সঙ্গে সঙ্গে কাছে চলে এসে আবার পিছনে পিছনে শুরু করে ছুটতে।

লোকটি আবার খৈনি পোরে মুখে। সঙ্গে সঙ্গে গজাতে শুরু করে স্ফটিকের নতুন দাড়ি আর ভিজে নিশ্বাস মুহূর্তের মধ্যে গোঁফ, ভুরু আর চোখের পাতায় সাদা পাউডার হয়ে জমতে থাকে। হেন্ডারসনের বাঁ ফালিতে আগের মতো ঝরণা নেই। প্রথম আধ ঘণ্টায় তো একটাও ঝরণা চোখে পড়ে নি। কিন্তু তারপরেই দুর্ঘটনাটা ঘটল। জায়গাটা দেখে কিছু বোঝবার উপায় ছিল না। নরম তুষারের অবিচ্ছিন্ন আস্তরণ নিম্নাংশের কঠিনতার কথাই ঘোষণা করছিল। হঠাৎ হুড়মুড় করে জলের মধ্যে পড়ল লোকটি। গর্তটা খুব গভীর নয়। কোনোরকমে নিজেকে টেনে হিঁচড়ে কঠিন জায়গার ওপর এসে উঠল যখন, হাঁটু অবধি ভিজে গেছে।

রাগত কণ্ঠে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে লোকটি। ছটার মধ্যে শিবিরে পৌঁছতে পারবে ভেবেছিল। এখন আরো এক ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। আগুন জ্বেলে পায়ের জুতো মোজা সব শুকিয়ে নিতে হবে। এত নিম্ন তাপমাত্রায় এটা বাধ্যতামূলক। দিক পরিবর্তন করে লোকটি পাড়ের ওপর উঠে আসে। পাড়ের ওপর কয়েকটা ছোট ছোট গাছের গুঁড়ির চারদিক ঘিরে গজানো ঝোপঝাড়ের গায়ে এসে আটকে রয়েছে বেশ কিছু জ্বালানি কাঠকুটো। গ্রীষ্মকালে জোয়ারের জলে ভেসে এসেছিল। কাঠকুটোর মধ্যে বড়সড় কিছু ডালপালাও আছে। আর আছে, গত বছরের শুকনো পাতার রাশি। বরফের ওপর প্রথমেই ও কটা বড়সড় ডাল বিছিয়ে দেয়। তা না হলে আগুন জ্বালা মাত্র বরফ গলে সব জলে চুবে নিভে যাবে। পকেট থেকে বার্চ গাছের একটা ছাল বের করে, কাগজের টুকরোর চেয়েও এতে দ্রুত আগুন ধরে। জ্বলন্ত টুকরোটাকে বড় ডালপালার ওপর রেখে এবারও তার ওপর শুকনো ঘাস আর ছোট-ছোট ডালপালা চড়াতে শুরু করে।

অত্যন্ত সতর্কভাবে ধীরেসুস্থে ও কাজ করে চলে। আশু বিপদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ। আগুনের শিখা আকারে ক্রমে বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় দেখে ডালপালা গুঁজে যায়

লোকটি। তুষারের ওপর হুঁ গেড়ে বসে। ডালপালার জঞ্জাল থেকে একটা করে ডাল টেনে নিচ্ছে আর সটান গুঁজে দিচ্ছে আগুনে। ও জানে এখন কোনোমতেই ব্যর্থ হওয়া চলবে না। তাপমাত্রা যখন শূন্য থেকে পঁচাত্তর ডিগ্রি নিচে নেমে যায় তখন আগুন জ্বালাবার প্রথম প্রচেষ্টায় বিফল হওয়া মারাত্মক। বিশেষ করে তার পা দুটো যদি ভিজে থাকে। পা যদি ভিজে না থাকে তাহলে আগুন জ্বালাতে না পারলেও আধ মাইল ছুটে রক্ত সঞ্চালন ফিরিয়ে আনা যায়। কিন্তু ভিজে বরফজমাট পায়ের রক্ত সঞ্চালন শুধু ছুটে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। তাপমাত্রা এখন হিমাঙ্ক ছাড়িয়ে পঁচাত্তর ডিগ্রি নেমে গেছে কাজেই যত জোরেই ছুটুক না কেন ওর ভিজে পা জমাট বাঁধবেই।

লোকটি এসব কথা ভালোভাবেই জানে। গন্ধক খাঁড়ির অভিজ্ঞ লোকটির কাছে গত বছর এসব গল্পই শুনেছে। লোকটিকে মনে মনে ধন্যবাদ জানায় ওকে এই গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দেওয়ার জন্যে। ইতিমধ্যেই তার পায়ের অনুভূতি লোপ পেয়েছে। আগুন জ্বালাবার জন্যে দস্তানা খুলতে বাধ্য হয়েছিল বলে আঙুলগুলো অবশ হয়ে গেছে। এতক্ষণ ঘণ্টায় চারমাইল বেগে হাঁটছিল তাই হৃৎপিণ্ডটা রক্ত পাম্প করে পাঠাচ্ছিল শরীরের সবখানে—প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত। কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়া মাত্র পাম্পের গতি গেছে কমে। মহাশূন্য থেকে ঝরে পড়ছে শীতলতা—পৃথিবীর এই অনাচ্ছাদিত শীর্ষাঞ্চলে প্রচণ্ড তার দাপট। আর সেই ভয়ংকরের দাপটে তার দেহের রক্তও যেন ভয় পেয়েছে। ঠিক কুকুরটার মতোই বোধহয় জ্যান্ত তার দেহের রক্ত। তাই কুকুরটার মতো রক্তও চাইছে এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে লুকিয়ে পড়তে। ঘণ্টা পিছু চার মাইল করে হাঁটার সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কিন্তু এখন তাতে ভাঁটা পড়েছে, তার দেহের অন্দরমহলের কোনো এক ফোকরে গিয়ে সব জমা হয়েছে। অঙ্গের প্রান্তভাগগুলো প্রথম টের পেয়েছে রক্তের এই অনুপস্থিতি। ভিজে পা দুটো দ্রুত থেকে দ্রুততর জমে যাচ্ছে, বেআবরু আঙুলগুলো জমে না গেলেও ক্রমশই আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে। নাক আর গালও জমতে শুরু করেছে। সারা গায়ের চামড়া হিমশীতল হয়ে উঠছে রক্তসঞ্চালন কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু ওর আর ভয় নেই। আঙুল, নাক আর গালটাতেই যা তুষার ক্ষত হবে। আগুনটা বেশ গনগন করে জ্বলছে। আঙুলের মতো চিকন দেখে ডাল সরবরাহ করছে এখন, কয়েক মিনিটের মধ্যেই কব্জির আকারের ডাল গুঁজতে পারবে। তখন ভিজে জুতো মোজা খুলে ফেলতে পারবে। যতক্ষণ না সেগুলো শুকনো হচ্ছে নগ্ন পা দুটো আগুনের ধারে রেখে সেঁকবে। বলাই বাহুল্য তার আগে বরফ দিয়ে পা দুটো খানিকক্ষণ ঘষে নিতে হবে। আগুনটা ভালোভাবে জ্বলছে। ও এখন নিরাপদ। গন্ধক-খাঁড়ির প্রবীণ লোকটার কথা মনে পড়তেই ওর হাসি পায়। লোকটি খুব জোর দিয়ে ঘোষণা করেছিল যে তাপমাত্রা শূন্যের নিচে পঞ্চাশ ডিগ্রি নেমে গেলে এই ক্লনডাইকে কারুর একা পথে বেরোনো উচিত নয়। কিন্তু এই তো ও এখানে এসেছে, একাই এসেছে এবং দুর্ঘটনায়ও পড়েছে, তবু নিজেকে ঠিক বাঁচিয়েছে তো। আসলে মাথা গরম না করলে কোনো বিপদই বিপদ নয়। পুরোনো দিনের লোকগুলোর একটু মেয়েলি স্বভাব হয়। মরদের মতো মরদ হলে যে কেউ একা পথে বেরোতে পারে। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে যে তার নাক আর গাল দুটো অত্যন্ত দ্রুত জমে যাচ্ছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে তার আঙুলগুলো যে প্রাণ হারিয়ে ফেলবে ভাবতেও পারে নি। সত্যিই কোনো অনুভূতি নেই আঙুলে। কোনোরকমে আঙুল দিয়ে এখন মুঠো করে ডাল ধরতে পারছে। নাড়াচাড়া করা প্রায় দুঃসাধ্য। মনে হচ্ছে আঙুলগুলো

যেন তার নিজের দেহের অংশ নয়। একটা ডাল ছুঁয়ে ওকে (রে নজর দিতে হচ্ছে যে সত্যিই সে ডালটা মুঠো করে ধরেছে কিনা।

তবে এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। আগুন তো জ্বলছেই। চড়চড় শব্দ হচ্ছে অগ্নিকুণ্ডে আর তার প্রতিটি নৃত্যরত শিখা যেন জীবনের পক্ষে শপথ নিচ্ছে। লোকটি তার মোকাসিন জুতো খুলতে শুরু করে। পুরো জুতোটার ওপরেই কঠিন বরফ জমেছে। মাঝহাঁটু অবধি টানা মোটা জার্মান মোজাগুলো যেন লোহার পাত আর মোকাসিনের ফিতেগুলো যেন প্যাঁচানো লোহার রড। অবশ আঙুল দিয়ে কিছুক্ষণ টানাটানি করেই ও নিজের বোকামির কথা বুঝে পকেট থেকে ছুরিটা বের করে নেয়।

কিন্তু ফিতে কাটার আগেই ব্যাপারটা ঘটে। দোষটা ওরই। অবশ্য দোষ না বলে ভুল বলাই ভালো। গাছের তলায় আগুন জ্বা‌লানো ঠিক হয় নি। ফাঁকা জায়গায় আগুন জ্বালানো উচিত ছিল। কিন্তু ঝোপ থেকে ডালপালা টেনে সোজা আগুনে গুঁজে দেবার সুযোগটা ছিল এখানে। যে গাছটার তলায় ও আগুন জ্বেলেছে তার প্রতিটি ডালপালার ওপরেই জমে ছিল তুষার। কয়েক সপ্তাহ ধরে মোটেই বাতাস বয় নি, তাই ডালপালাগুলোর ওপর তাদের ভার বহনের শেষ সীমা অবধি তুষার জমেছে। যতবার একটা করে ডাল টেনেছে সামান্য কাঁপুনি লেগেছে গাছটায়। সেটা ওর চোখে অত্যন্ত অকিঞ্চিতকর হলেও দুর্ঘটনা বাধাবার পক্ষে যথেষ্ট। গাছের ওপর দিকের একটা ডাল থেকে হঠাৎ ঝরে পড়ল বরফের বোঝা। ঝরে পড়া বরফের বোঝা এসে পড়ল নিচের ডালগুলোর ওপর, আর সেগুলো থেকে ঝরে পড়ল আরো তুষার আরো অনেক ডালের ওপর। এই প্রক্রিয়া দ্রুত বিস্তার লাভ করল সারাটা গাছ জুড়ে। বিনা সঙ্কেতে হঠাৎ এক তুষার প্রপাত সৃষ্টি হল। আগুনের ওপর ধ্বসে পড়ল রাশি রাশি স্তূপ স্তূপ তুষার। দেখলে বোঝা যাবে না যে একটু আগেও এখানে অমন গনগনে আগুন জ্বলছিল।

লোকটি স্তম্ভিত। এ যেন স্বকর্ণে নিজের মৃত্যুদণ্ডাদেশ শোনা। নির্বাপিত অগ্নিকুণ্ডটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে বসে রইল ও মুহূর্তক্ষণ। তারপর সমস্ত অস্থিরতা একেবারে শান্ত হয়ে এল। গন্ধক-খাঁড়ির লোকটা বোধহয় ঠিকই বলেছিল। এখন একজন সঙ্গী থাকলে কোনো বিপদ হত না। সেই আবার আগুন জ্বালতে হবে। এবার আর ব্যর্থ হলে চলবে না। অবশ্য আগুন জ্বালতে পারলেও পায়ের কয়েকটা আঙুল বোধহয় খোয়াতেই হবে। ইতিমধ্যেই পা দুটো বেশ জমে গেছে। আগুন জ্বালতেও তো খানিকটা সময় লাগবে।

লোকটি কিন্তু নিষ্কর্মার মতো শুধু বসে বসে চিন্তাস্রোতে গা ভাসায় নি। এই সময়টুকুর মধ্যেই সে আরেকটা আগুন জ্বালবার প্রস্তুতি নিয়েছে। এবার কাঠকুটো জড়ো করেছে ফাঁকা জায়গাতেই। এবার কোনো গাছ আর শয়তানি করে আগুন নেভাতে পারবে না। নদীর উঁচু পাড় থেকে শুকনো ঘাস আর ছোট ছোট ডালপালা সংগ্রহ করতে এগিয়ে এসেও মুশকিলে পড়তে হয়। আঙুলগুলোকে কিছুতেই বশ মানাতে পারছে না, বাছাই করে তুলবে কী করে ঘাস বা ডালপালা! শেষে মুঠো ভর্তি করে যা পারে তুলে নেয়। কিছু অবাঞ্ছিত পচা ডালপালা আর কাঁচা ঘাসও উঠে আসে। কিছু করার নেই। নিয়মানুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। এমন কি কতকগুলো বড় ডালও হাতের কাছে যোগাড় করে রেখেছে আগুন ভালো করে ধরার পর গুঁজে দেবে বলে। ওর ওপর নজর রেখে চুপ করে বসে আছে কুকুরটা। অধীর আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ তার দৃষ্টিতে, কারণ লোকটিই তাকে যোগাড় করে এনে দেবে আগুন। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে যে!

সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেয় লোকটি। বার্চ গাছের শুকনো

আরেক টুকরো ছাল আছে পকেটে। ছালটা আঙুলে ঠেকেছে, খড়খড় শব্দ শুনতে পাচ্ছে কিন্তু তবু কিছুতেই আর ধরতে পারে না। একদিকে নিরলস প্রয়াস অন্যদিকে সারাক্ষণের মানসিক দংশন যে প্রতি মুহূর্তেই তার পা দুটো আরো জমে যাচ্ছে। এই চিন্তাটা তাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে ফেলতে চাইছে কিন্তু তার বিরুদ্ধে ও সফল লড়াই চালিয়ে শান্তভাব বজায় রেখেছে। দাঁত দিয়ে হাতের দস্তানা দুটো খিমচে ধরে টান মেরে খুলে নেয়। হাত দুটো দুলিয়ে দুলিয়ে সজোরে পায়ের ওপর আঙুল দিয়ে বাড়ি মারে অনুভূতি ফিরিয়ে আনতে। প্রথমে বসে বসে মারছিল তারপর উঠে দাঁড়িয়ে। কুকুরটা সেই বরফের মধ্যে বসে আছে। লোমশ লেজটা পেঁচিয়ে রেখেছে সামনের পা দুটো ঢেকে। নেকড়ের মতো ছুঁচোলো কানদুটো সামনের দিক করে খাড়া—উৎকর্ণ। মানুষটির কার্যকলাপ দেখছে। লোকটি আঙুলের অনুভূতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে আর কুকুরটাকে দেখে তার হিংসে হয়। কেমন লোমের স্বাভাবিক আবরণে তলায় উষ্ণতার আমেজ পোয়াচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে হাতের আঙুলগুলোয় সে অনুভূতি ফেরার একটা সুদূরবর্তী অনুভূতির প্রথম সঙ্কেত পেল। মৃদু দপদপানিটা ক্রমে তীব্র বেদনার রূপ নেয় কিন্তু লোকটি তাতে খুশিই বোধ করে। ডান হাত থেকে দস্তানাটা খুলে পকেট থেকে গাছের ছালের টুকরোটা বের করে আনে। খোলা আঙুলগুলো আবার দ্রুত অবশ হয়ে আসছে। গন্ধক দেশলাইগুলোর বান্ডিলটাও এবার বের করেছে। বান্ডিল থেকে একটা কাঠি আলাদা করতে গিয়ে পুরো বান্ডিলটাই পড়ে গেল বরফের ওপর। কাঠিগুলোকে বরফ থেকে কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। তীব্র শীত তার আঙুলের প্রাণ হরণ করেছে। মৃত আঙুলগুলো কিছু ছুঁতে পারছে না, ধরতেও পারছে না। অত্যন্ত সতর্ক হয়ে জমাট বাঁধা পা, নাক আর গালের সব দুশ্চিন্তা মন থেকে সরিয়ে একাগ্রচিত্তে দেশলাই পুনরুদ্ধারে উঠে পড়ে লাগে। স্পর্শানুভূতির অভাব দৃষ্টিশক্তিকে ব্যবহার করে পূরণ করে নিতে চায়। দেশলাইয়ের বান্ডিলটার দুধারে আঙুলগুলো পৌঁছেছে দেখে আঙুলগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে। না, বলতে ভুল হল—আঙুলগুলো মুঠো করারই ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু আঙুলগুলো তার নির্দেশ মানে নি। ডান হাতের দস্তানাটা গলিয়ে নিয়ে লোকটি এবার হাঁটুর ওপর ক্ষ্যাপার মতো একটা থাপ্পড় কষায়। দস্তানা পরা দু'হাত দিয়ে এক রাশ বরফ সমেত দেশলাইয়ের বান্ডিলটা তুলে নিয়েছে কোলে। তবু কোনো লাভ হয় নি।

একটু পরে কোনোক্রমে বান্ডিলটাকে সে দস্তানা পরা দু হাতের চেটোর মধ্যে চেপে মুখের কাছে উঁচু করে ধরল। তীব্র চাপ দিয়ে মুখ ফাঁক করতেই কড়মড় শব্দে জমাট বরফগুলো ফুটিফাটা হয়ে গেল। নিচের ঠোঁটটা মুখের ভেতর দিকে মুড়ে ওপরের পাটির দাঁত দিয়ে বান্ডিল থেকে একটা কাঠিকে আলাদা যদি বা করল, কাঠিটা মুখ থেকে খসে পড়ল কোলে। কিছুতেই আর কুড়োতে পারে না। শেষ পর্যন্ত মুখ নামিয়ে দাঁতে করে চেপে কাঠিটাকে তুলে আনল। দাঁতে করে চেপেই কাঠিটাকে ঘষতে শুরু করল পায়ের ওপর। একবার দুবার তিনবার—কমপক্ষে কুড়িবার চেষ্টা করার পর দেশলাই জ্বলল। জ্বলন্ত দেশলাইটা দাঁতে চেপেই গাছের ছালটায় আগুন ধরাবে ভেবেছিল কিন্তু বিচ্ছিরি ধোঁয়াটা নাক হয়ে একেবারে ফুসফুসে গিয়ে সেঁধিয়েছে। আচমকা কাশির দমকে দিশেহারা হতেই কাঠিটা বরফের ওপর খসে পড়ে নিভে গেল।

সালফার ক্রিকের অভিজ্ঞ স্যাণ্ডাত ঠিকই বলেছিল। এখন সে কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। হিমাঙ্কের পঞ্চাশ ডিগ্রি নিচে সঙ্গী ছাড়া পথে বেরোনো উচিত নয়। হাত দুটো বারবার ঠুকেও কোনো অনুভূতি ফিরে পায় না। হঠাৎ ও দাঁতে চেপে দস্তানাটাকে দু

হাতের চেটোর মধ্যে চেপে ধরল। হাতের পেশিগুলো জমে যায় নি বলেই পেরেছে। এবার পুরো বান্ডিলটাকে পায়ের ওপর ঘষতেই এক সঙ্গে সত্তরটা দেশলাই কাঠি দপ্ করে জ্বলে উঠল। একটুও হাওয়া নেই তাই নেভবার ভয়ও নেই। শ্বাসরোধকারী ধোঁয়া এড়াবার জন্যে লোকটা মাথাটা একটু কাত করে রাখে। গাছের ছালটা বাড়িয়ে ধরে জ্বলন্ত কাঠিগুলোর ওপর। এতক্ষণে হাতে একটা অনুভূতি পায়। হাতের চামড়া পুড়ছে। নাকে আসছে পোড়া গন্ধটা। চামড়ার তলায় প্রথম পাওয়া অনুভূতিটা ক্রমশ যন্ত্রণার রূপ নেয়। যন্ত্রণা ক্রমশ তীব্রতর হয়ে ওঠে। তবু দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণার কথা ভুলে গাছের ছালটায় অগ্নিসংযোগ করতে চায়। সহজে ধরতে চায় না ছালটা। জ্বলন্ত দেশলাই কাঠির আগুনের বেশির ভাগ তাপটাই খরচ হয়ে যাচ্ছে তার হাতের ছাল চামড়া মাংস পোড়াবার কাজে।

সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে এক ঝটকায় হাত দুটো ফাঁক করল লোকটি। জ্বলন্ত কাঠিগুলো বরফের ওপর পড়ে চড়বড় করে উঠে নিভে গেল। গাছের ছালটায় কিন্তু আগুন ধরে গেছে। এক এক করে শুকনো ঘাস আর ছোট ছোট ডালপালাগুলোকে সে আগুনের মধ্যে গুঁজতে শুরু করল। মুশকিল হচ্ছে ওর পক্ষে তেমনভাবে বাছাই করা সম্ভব নয়। দুহাত এক করে তালুর মধ্যে চেপে ডালপালাগুলো তুলে নিতে হচ্ছে। তাই পচা কাঠের ছোট ছোট টুকরো আর কাঁচা ঘাসও লেগে থাকছে অনেক ক্ষেত্রেই। যতটা পারে দাঁত দিয়ে কামড়ে সে ওগুলোকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। আগুন জ্বলাবার ভঙ্গিমাটি যতই অদ্ভুত হোক সতর্কতার কিন্তু কমতি নেই। এখন আগুনও যা জীবনও তাই। কিছুতেই আগুন নিভতে দেওয়া চলবে না। দেহের বহির্ভাগে রক্তশূন্যতার দরুন লোকটি এবার কাঁপতে শুরু করে। নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা আরো হ্রাস পায়। এবার অগ্নিকুণ্ডের ঠিক ওপরে খসে পড়ে কাঁচা ঘাসের বেশ বড়ো একটা চাঙড়। আঙুলে করে ঘাসটাকে সরিয়ে দিতে চায় কিন্তু হিতে বিপরীত ঘটে। নিয়ন্ত্রণহীন আঙুলটা আগুনটাকে বেশি মেটে ফেলে। জ্বলন্ত ঘাস আর ছোট ছোট ডালপালাগুলো চারধারে ছড়িয়ে পড়ে। আবার সেগুলোকে একত্রিত করার চেষ্টা করেও তাকে হার স্বীকার করতে হয়। হাত পা এমনই ঠক ঠক করে কাঁপছে! ছড়ানো ডালপালাগুলো এক এক করে কালো ধোঁয়া ছাড়ে আর নিভে যায়। আগুন আর জ্বালা হয় না। তার অসহায় করুণ চোখের দৃষ্টি হঠাৎ গিয়ে পড়ে কুকুরটার ওপর। নিহত অগ্নিকুণ্ডের ওধারে বরফের ওপর বসে রয়েছে। অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে তার অঙ্গভঙ্গিতে। একবার সামনের ডান পাটা একটু উঁচু করছে তারপর আবার বাঁ পাটা। ব্যাকুল আগ্রহে একবার এ পা আর একবার ও পায়ের ওপর দেহের ওজন রাখছে।

কুকুরটার দিকে তাকাতেই একটা উন্মাদ চিন্তা তার মাথায় ভিড় করে। গল্পে পড়েছিল একটি লোক একবার তুষার-ঝড়ের মধ্যে আটকা পড়ার পর একটি হরিণ মেরে তার শবদেহের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে বসে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। ঠিক এমনিভাবে কুকুরটাকে খুন করে ওর গরম শরীরের মধ্যে হাত দুটো গুঁজে রাখা যেতে পারে। কিছুক্ষণ বাদে নিশ্চয় অবশ ভাবটা কেটে যাবে। তখন সে আবার আগুন জ্বালতে পারবে। কুকুরটাকে ও কাছে ডাকে কিন্তু তার শঙ্কাজড়িত অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শুনে জন্তুটিও ভীতি বোধ করে। এমনভাবে লোকটিকে কখনও কথা বলতে শোনে নি। অবোধ প্রাণীও বুঝতে পারে কিছু একটা ঘটেছে। ব্যাপারটা ঠিক কিনা পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও, তার সন্দেহপ্রবণ মনটা বিপদের গন্ধ পায়। লোকটির ডাক শোনা মাত্র কুকুরটা তার ঝাড়া কান নামিয়ে নেয়, তার অস্থিরতা আরো বৃদ্ধি পায়। সামনের পা দুটো আরো ঘন ঘন নাড়ে কিন্তু লোকটির কাছে আসার বিন্দুমাত্র আগ্রহ অনুভব করে না। লোকটি এবার চার হাত পায়ে হামাগুড়ি

দিয়ে এগোবার চেষ্টা করে। আর এই বিচিত্র ভঙ্গি দেখে কুকুরটার সন্দেহের মাত্রা আরো বাড়ে। কুকুরটা খানিক দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ায়।

লোকটি বরফের ওপর বসেই মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে চেষ্টা করে। দাঁত দিয়ে টেনে দস্তানা দুটো হাতে গলিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। পায়ে কোনো অনুভূতি নেই তাই ভালো করে জমির দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করতে হচ্ছে, সত্যিই সে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিনা। লোকটিকে স্বাভাবিকভাবে উঠে দাঁড়াতে দেখেই কুকুরটির সন্দেহের ভাবটা হাল্কা হয়ে আসে। সেই সুপরিচিত প্রভুত্ববাঞ্জক শাসানি কানে যেতেই সে স্বভাবসুলভ আনুগত্যে লোকটির দিকে এগিয়ে আসে। কুকুরটাকে হাতের নাগালে পেতেই সে আচমকা দুহাত বাড়িয়ে কুকুরটার টুঁটি টিপে ধরতে চায়। পরক্ষণেই তার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। অবশ আঙুলগুলো আর ভাঁজ করা যাচ্ছে না। কিছু টিপে ধরাও সম্ভব নয়। ব্যাপারটা মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যাওয়ায় কুকুরটা পালাবার সুযোগ পায় নি। দুহাতে কুকুরটাকে জাপটে ধরে লোকটি বরফের ওপর বসে পড়ে। ক্ষুব্ধ কুকুরটা রাগে গরগর করে ওঠে। বাঁধন ছাড়াবার জন্যে গায়ের জোর খাটায়।

কুকুরটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বসে থাকা ছাড়া লোকটির আর কিছু করার নেই। পরিষ্কার বুঝতে পারছে কুকুরটাকে মারা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ অকেজো আঙুল দিয়ে না ধরতে পারবে ছুরি, না পারবে টুঁটি টিপে মারতে। তাই হাতের বাঁধন আলগা করে দিতেই কুকুরটা পাগলের মতো পেটের মধ্যে লেজ পুরে ছুটে পালাল। চল্লিশ ফুট দূরে গিয়ে দাঁড়াল কুকুরটা। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কান খাড়া করে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল লোকটিকে।

লোকটি তার হাত দুটোর দিকে চোখ ফেরায়। হাত দুটো শরীরের দুপাশে ঝুলছে। ভাবতেই অবাক লাগে যে চোখের নজরের ওপর নির্ভর করে তাকে এখন হাত দুটো কোথায় রয়েছে সেই খোঁজ নিতে হচ্ছে। আবার হাত দুলিয়ে দুলিয়ে পায়ের ওপর বাড়ি মারতে শুরু করে। এক নাগাড়ে মিনিট পাঁচেক ধরে প্রাণপণে থাপ্পড় মেরে খানিকটা সুফল মেলে। হৃৎপিণ্ডের কৃপায় শরীরের উপরিভাগেও কিঞ্চিৎ পরিমাণ রক্ত চলাচল শুরু হওয়ায় কাঁপুনিটা বন্ধ হয়েছে। হাতে কিন্তু কোনো অনুভূতিই সঞ্চারিত হয় নি। দুটো পাল্লার মতো হাত দুটো তার দুবাহুর প্রান্তে ঝুলছে বলে মনে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এই ধারণার সমর্থনে অনুভূতিরা বিন্দুমাত্র সাহায্য করছে না।

এবার মৃত্যুভীতি তাকে গ্রাস করতে শুরু করে। ভয়টা আতঙ্কের রূপ গ্রহণ করতে দেরি হয় না। স্পষ্ট বুঝতে পারছে ব্যাপারটা এখন আর শুধু হাত ও পায়ের কটা জমে যাওয়া আঙুল খোয়া যাওয়ার মধ্যেই সীমিত নেই। প্রশ্নটা জীবন-মৃত্যুর এবং পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে প্রতিকূল। ত্রাসে আতঙ্কে ক্ষিপ্তপ্রায় লোকটি অকস্মাৎ দৌড়াতে শুরু করে আবছা পুরোনো পথরেখা ধরে। উদ্দেশ্যবিহীন, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। ভয়ই তাকে এমনভাবে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জীবনে সে কখনো এমন ভয় পায় নি। তুষারের মধ্যে ছুটতে গিয়ে নাকাল হতে হয় পদে পদে। খানিকক্ষণ বাদে আবার সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। ওই তো খাঁড়ির কিনারা—গুঁড়ি আটকে আছে নদীর জমাট বুকে—ওই তো পাতা-ঝরা পপলার গাছ আর আকাশ। ছুটে উপকারই হয়েছে। কাঁপুনিটা আর নেই। হয়তো আরো ছুটলে পায়ের বরফ গলে যাবে, এমন কি বেশ কিছুদূর যদি ছুটতে পারে তো তাঁবুতেই গিয়ে হাজির হবে। সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। হাত পায়ের কয়েকটা আঙুল আর মুখের অংশবিশেষ নিশ্চয় হারাতে হবে কিন্তু বন্ধুরা তাকে ঠিক প্রাণে বাঁচাবে। আশার সঙ্গে সঙ্গে

নিরাশার মেঘও মনের কোণে ছায়া বিছোয়। মনে হয় ক্যাম্পে ফেরা আর তার হবে না। পথ তো আর কম নয়। ইতিমধ্যেই সারা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে তুষার-ক্ষত। কিছুক্ষণের মধ্যেই শীতল শরীর কঠিন হয়ে মৃত্যু আসবে। মৃত্যুর চিন্তাটাকে সে মন থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই একই চিন্তা এসে ভিড় জমায়। তখন সে অন্য কথা ভেবে জোর করে চিন্তাস্রোতকে ভিন্নমুখী করতে চায়।

ভাবতে অবাক লাগে যে এখনও সে ছুটতে পারছে। পা দুটো এমন জমে গেছে যে মাটি স্পর্শ করার অনুভূতিটা পর্যন্ত লোপ পেয়েছে অথচ এই পা দুটোই তার দেহের ভার বহন করছে। মনে হচ্ছে মাটির সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই, শুধু হাওয়ায় ভেসে চলেছে। কোথায় একবার সে ডানাওলা মার্কারি দেবতার ছবি দেখেছিল। মার্কারি দেবতারও কি এইরকম লাগে পৃথিবীর ওপর ভেসে ভেসে বেড়াতে?

ক্যাম্প অবধি ছুটে যাওয়ার চিন্তাটার মধ্যে একটাই খুঁত ছিল। ওর সে ক্ষমতা আর নেই। ছুটতে ছুটতেই বেশ কয়েকবার হোঁচট খায় তারপর একেবারে মাথা ঘুরে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। উঠতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। এখন একটু বসে জিরিয়ে নেওয়া দরকার। আর ছোটা চলবে না, হেঁটে হেঁটেই এগোতে হবে। কিছুক্ষণ বসার পর দম ফিরে পেয়ে লক্ষ্য করে এখন আর আগের মতো শীত করছে না। কাঁপুনি তো বন্ধ হয়েইছে, এমন কি বুকে আর থাইয়ে একটা উষ্ণতার ছোঁয়া লেগেছে। কিন্তু নাক আর গাল স্পর্শ করে দেখে কোনো অনুভূতি নেই। শুধু ছুটে নাক গাল বা হাত কি পা কোনোটারই জমাট ভাব কাটবে না। হঠাৎ মনে পড়ে যায় যে তার জমাট অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ক্রমশ ফুলে ফুলে উঠছে। এই নিয়ে ও আর ভাবতে চায় না। চিন্তাটাকে ভুলতে অন্য কথা ভাবতে চায়। না হলে আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পড়তে পারে। চিন্তাটা কিন্তু কিছুতেই ওর সঙ্গ ছাড়ে না। শেষ পর্যন্ত মানস চক্ষে ভেসে ওঠে একটা তুষার জমাট মানুষের ছবি। ছবিটা তারই। অসহ্য—অসহ্য এই চিন্তা। আবার সে পাগলের মতো ছুটতে শুরু করে। একবার গতি কমিয়ে হাঁটতে গিয়েছিল কিন্তু আবার সেই জমে যাওয়ার ভয় তাকে ছুটতে বাধ্য করিয়েছে।

কুকুরটা ওর পায়ে পায়ে ছুটছিল। আবার পড়ে যেতেই কুকুরটা ওর সামনে এসে মুখোমুখি বসে পড়ল। লেজটা পেঁচিয়ে সামনের পা দুটো ঢেকে অধীর উৎসুক চোখে চেয়ে আছে। কুকুরটার উষ্ণ দেহ, নিঃসংশয় প্রাণ লোকটিকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করে। এমন গালিগালাজ শুরু করে যে কুকুরটা তার খাড়া কান নুইয়ে ফেলে। এবার কিন্তু আরো তাড়াতাড়ি কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে। বরফের সঙ্গে লড়াইয়ে সে হেরে যাচ্ছে। শীতলতা অতি সন্তর্পণে তার দেহের প্রতিটি অঙ্গে অনুপ্রবেশ করছে। লোকটি আবার দৌড় শুরু করে। এবার আর একশো ফুটও যেতে হয় না, তার আগেই একেবারে মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ে। দম আর আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ফিরে পেতেই লোকটি উঠে বসে। ভাবে, মরতেই যদি হয় সসম্মানে মরাই ভালো। আসলে তার একটা উপমার কথা মনে পড়ে গেছে। একটা ছিন্ন-মস্তক মুরগির এলোপাথাড়ি ছুটে বেড়ানোর মতোই বোকামি করছে সে। মরতে যখন তাকে হবেই, আর ঠাণ্ডায় জমেই মরতে হবে, তখন ভালোভাবে মরাই তো ভালো! এই নতুন পাওয়া মানসিক প্রশান্তির সঙ্গে সঙ্গেই তন্দ্রা ঘনিয়ে আসে। ভাবে, এ ঘুম যদি আর না ভাঙে সেই তো ভালো। এ যেন অজ্ঞান করার জন্য ওষুধ খাওয়াবার পরের অবস্থা। জমে মরাটা এমন কী খারাপ। এরচেয়েও তো কত কষ্টকরভাবে এবং হাজার উপায়ে মরণ আসতে পারে।

ঠিক ছবির মতো চোখের সামনে দেখে পরের দিন তার দলের ছেলেরা এসেছে তার

খোঁজে। দেখে সেই অনুসন্ধানকারী দলের মধ্যে সে নিজেই এসেছে নিজের খোঁজে। সদলবলে এগোতে এগোতে পথের একটা বাঁক ঘুরেই সে নিজেকে দেখতে পায়। তুষার শয়নে শায়িত। এখন আর ও নিজের মধ্যে নেই। নিজের বাইরে আর পাঁচজনের সঙ্গে এক হয়ে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে। সত্যিই প্রচণ্ড শীত পড়েছে। আমেরিকায় ফিরে বন্ধুবান্ধবদের বলতে পারবে সত্যিকার ঠাণ্ডা কাকে বলে। চিন্তা প্রবাহে হঠাৎ ছেদ পড়ে। সালফার ক্রিকের পুরোনো স্যাঙাতের কথা মনে পড়ে যায়। স্পষ্ট দেখতে পায় ও এখন আরামে বসে উষ্ণতার আমেজ পোয়াচ্ছে আর পাইপ টানছে।

'তুমি ঠিকই বলেছিল হে—ঠিকই বলেছিলে।' সালফার ক্রিকের ঝানু লোকটিকে যেন শোনাতে চায় কথাগুলো।

এতক্ষণে লোকটি ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে। ঘুমিয়ে যে এত সুখ, ঘুম যে এত আরামের হতে পারে এই প্রথম সে জানল। কুকুরটা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। ক্ষণস্থায়ী দিবস প্রলম্বিত গোধূলিতে পদার্পণ করল কিন্তু আগুন জ্বালাবার কোনো লক্ষণ নেই। তাছাড়া কুকুরটা এই প্রথম দেখছে যে আগুন না জ্বেলে কোনো মানুষ বরফের মধ্যে এমনভাবে চুপ করে বসে থাকতে পারে। যতই সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসে আগুনের আকাঙ্ক্ষায় কুকুরটার অস্থিরতা তত বাড়ে। পা দুটো বারবার নাড়ায়। তার চাপা কণ্ঠের গোঙানি শুনে লোকটি নিশ্চয় শাসাবে বলে আগেভাগেই কান দুটো নামিয়ে নেয়। লোকটি কিন্তু নীরব। কুকুরটা এবার উচ্চস্বরে ডেকে ওঠে। তবু সাড়া নেই। লোকটার কাছে কয়েক পা চুপিসারে এগিয়ে আসতেই সে মৃত্যুর গন্ধ পায়। কুকুরটা চমকে পিছু হটে আসে। তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে খানিকক্ষণ এক নাগাড়ে ঘেউ ঘেউ করে। তারাগুলো শীতল আকাশের বুকে জ্বল জ্বল করে নাচছে। এবার কুকুরটা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পায়ে হাঁটা পথটা ধরে ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে চলে। ও জানে ওখানে অনেক মানুষ আছে। তারা ওকে খেতে দেবে, আগুন জ্বালিয়ে দেবে।

গলেপর শেষে

এক

এবড়ো খেবড়ো কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরি টেবিলটা। যারা টেবিলটায় তাস নিয়ে 'হুইস্ট' খেলছে, তারা মাঝে মধ্যেই নিজেদের দিকে তাস টেনে আনতে অসুবিধেয় পড়ছে। অমসৃণ টেবিলের ওপর আটকে যাচ্ছে তাসগুলো। গায়ের জামা অবধি খুলে বসেছে সবাই। তবু মুখের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে! ওদিকে পশমের মোজা ও মোকাসিন পরে থাকলেও পাগুলো ঠাণ্ডায় যেন জমে অসাড় হয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট এই কেবিন ঘরটার মেঝে আর মেঝের মাত্র গজখানেক ওপরে, ঠিক এতটাই তাপমাত্রার প্রভেদ। লোহার পাত দিয়ে তৈরি ইউকোন স্টোভটা গনগন করে জ্বলছে, তবু মাত্র আট ফুট দূরে, দরজার পাশে মেঝের একটু ওপরে তাকে রাখা মাংসগুলো জমে একেবারে নিরেট হয়ে আছে। নিচের দিক থেকে দেওয়ালের এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে কেবিনের দরজাটাও বরফ জমে আটকে আছে। শোবার বাঙ্কের পিছনে কেবিনের দেওয়ালের কাঠের গুঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে সাদা বরফ জমে চকচক করছে। অয়েল পেপারের নিচের দিকটায় ঘরের মানুষদের নির্গত নিশ্বাস-বায়ু বরফ হয়ে জমে এক ইঞ্চি পুরু আবরণ সৃষ্টি করেছে।

বাজি ধরে হুইস্ট খেলা চলছে ওরা। যে জুটি হারবে তাকে এই ইউকোনের সাত ফুট পুরু বরফ আর তুষারের স্তর ভেদ করে মাছ ধরার জন্যে গর্ত খুঁড়তে হবে।

'মার্চ মাস পড়ে গেল, তবু এত ঠাণ্ডা।' তাস ভাঁজতে ভাঁজতে বলে উঠল একজন।

'কী মনে হচ্ছে বব?'

'তা মাইনাস পঞ্চান্ন বা ষাট ডিগ্রি তো হবেই। তুমি কী বল ডাক্তার?'

ডাক্তার মুখ ফিরিয়ে দরজার তলার দিকে একবার পরীক্ষামূলক দৃষ্টিতে তাকাল।

'পঞ্চাশের বেশি হবে না। উনপঞ্চাশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। দরজাটার দিকে তাকাও, কতটা বরফ জমেছে দেখলেই বুঝতে পারবে। সেবার যখন মাইনাস সত্তরে নেমে গিয়েছিল তাপমাত্রা, কম করে হলেও আরো চার ইঞ্চি উঁচু অবধি বরফ জমেছিল।'

দরজায় বাইরে থেকে কে যেন ধাক্কা দিল। ডাক্তার হাত তুলে তাস বাছতে বাছতেই বলল, 'কাম্ ইন্!'

যে লোকটি ঘরে ঢুকেছে বিশাল চেহারা তার। চওড়া কাঁধ। জাতে সুইডিশ। অবশ্য কানঢাকা টুপিটা খুলে মুখের গোঁফ দাড়ি থেকে বরফ ঝেড়ে না ফেললে বোঝার উপায় থাকত না সে কোন দেশের লোক। বরফের মুখোশে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল সব কিছু। আগন্তুক বরফ ঝেড়ে পরিষ্কার হতে হতেই ওরা হাতের খেলা শেষ করে ফেলল।

'শুনেছি এখানে একজন ডাক্তার এসেছেন!' উৎসুকভাবে প্রশ্ন করল লোকটি। বিচলিত দৃষ্টিতে প্রত্যেকের দিকেই একবার তাকালে সে। দীর্ঘকাল তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে তার রুক্ষ চোখে মুখে। 'আমি বহুদূর থেকে আসছি, হোয়াইয়োর ডান দিকের ফালি থেকে।'

'আমিই ডাক্তার। ব্যাপারটা কী?'

ডাক্তারের কথার রেশ ধরেই লোকটা যেন এবার তার বাঁ হাতটা উঁচু করে ধরল। বীভৎসভাবে ফুলে রয়েছে দ্বিতীয় আঙুলটা। কী করে এমন হল তারই অসংলগ্ন কাহিনীটা গড়গড় করে বলতে শুরু করে দিলসে।

'দেখি দেখি, আমায় দেখতে দাও আগে।' ধৈর্য হয়ে বলল ডাক্তার। 'টেবিলের ওপর হাতটা রাখ এই যে—এইভাবে।'

খুব আলতো করে সন্তর্পণে হাতটা রাখল লোকটি। যেন টলটলে একটা ফোঁড়া— এখুনি ফেটে যাবার ভয় আছে।

'ধ্যাত্—' ধমকে ওঠে ডাক্তার। 'এত ঘাবড়াবার কী হল! একশো মাইল পথ তো পায়ে হেঁটে এসেছ সারাবার জন্যেই। ভালো করে দেখো কী করছি, পরেরবার নিজেই করে নিতে পারবে।'

একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে ডাক্তার হঠাৎ তার ডান হাতটা দিয়ে দায়ের মতো সজোরে এক কোপ বসাল লোকটার স্ফীতকায় আঙুলটার ওপর। ত্রাসে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল লোকটি। একটা বুনো জন্তুর মতো শোনাল চিৎকারটা। লোকটা সত্যিই বুনো জন্তুর মতো প্রায় লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিল ডাক্তারের ঘাড়ে। এমন বিশ্রী রসিকতা সহ্য করা যায়?

'ব্যস্-ব্যস্—' ডাক্তারের তীক্ষ্ণ কর্তৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর ওকে নিরস্ত করল। 'এখন কেমন লাগছে? ভালো না? লাগতেই হবে ভালো। পরেরবার তুমি নিজেই নিজের চিকিৎসা করতে পারবে। কই স্ট্রদার্স—তাস দাও! এবার তোমাদের হারাবই।'

সুইডিশ লোকটির মুখে খুব ধীরে ধীরে স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল। ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে সে। বড়ি খাবার পর আঙুলের যন্ত্রণাটা চলে গেছে, বিস্মিত দৃষ্টিতে আঙুলটাকে পর্যবেক্ষণ করে লোকটি—ধীরে ধীরে ভাঁজ করে আর খুলে দেখে পরখ করছে লাগছে কিনা। এবার সে পকেটের মধ্যে হাত পুরে একটা সোনা ভর্তি থলে টেনে বের করল।

'কত দেব?'

ডাক্তার অধৈর্যভাবে ঘাড় নাড়ায়। 'কিছু না, আমি কি প্র্যাকটিস করছি নাকি, কই—তোমার দান বন্ধ।'

লোকটি ভারী ভারী পা ফেলে এগিয়ে গেল, আবার লক্ষ্য করল আঙুলটাকে, তারপর সপ্রশংস দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকাল।

'খুব ভালো লোক তো আপনি। কী নাম আপনার?'

'লিন্ডে, ডাক্তার লিন্ডে।' স্ট্রদার্স উত্তর দেয়, ডাক্তারকে বাড়তি হাঙ্গামা পোয়াবার হাত থেকে যেন বাঁচাতে চাইছে।

'দিনের অর্ধেকই তো কাবার হয়ে গেছে। আজকের রাতটা বরং এখানেই থেকে যাও।' এক রাউন্ড খেলা শেষ হলে ডাক্তার তাস ভাঁজতে ভাঁজতে লোকটিকে বলল। 'এত ঠাণ্ডায় বেরোনো ঠিক হবে না। একটা বাড়তি বাঙ্ক আছে এখানে, শোবার কোনো অসুবিধে নেই।'

ডাক্তারের পাতলা ছিপছিপে চেহারা। খয়েরি চুল, শ্যামবর্ণ মুখে পাতলা ঠোঁট—একজন বলিষ্ঠ মানুষ। পরিষ্কারভাবে কামানো গালের চামড়া সুস্বাস্থ্যের পরিচয় বহন করছে। অত্যন্ত তৎপর তাঁর প্রতিটি গতিবিধি। তাস ভাঁজছে, বিলি করছে, একবারও এলোমেলো হতে দিচ্ছে না। কালো চোখ দুটোতে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। চোখে চোখ রেখে ছাড়া তাকায় না। রোগা কমনীয় হাত দুটো সদা অস্থির। দেখলেই মনে হয় সূক্ষ্ম কাজে পারদর্শী সে। হাত দুটোর দিকে তাকালেই তার শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

'এবার আমাদের দান।' শেষবারের মতো তাস টেনে নিল ডাক্তার। 'দেখা যাক কে হারে আর কে জেতে। কে জানে, কার কপালে আজ গর্ত খোঁড়া আছে।'

আবার দরজায় করাঘাতের শব্দ। এবার ক্ষেপে যায় ডাক্তার। 'আজ আর দেখছি খেলা শেষ করা যাবে না।' ইতিমধ্যে দরজা খুলে দিতে এক অপরিচিত ব্যক্তি ঘরে এসে ঢুকল।

'কী ব্যাপার বলে ফেল।' ডাক্তার আগন্তুকের উদ্দেশে বলল।

আগন্তুক বৃথাই চেষ্টা করে তার বরফ জমা ঠোঁট আর চোয়াল ফাঁক করার। স্পষ্ট বোঝা যায় বেশ কয়েকদিন ধরে ও একটানা হেঁটেছে। গালের হাড় দুটোর কাছে চামড়াটা কালো হয়ে গেছে বারবার তুষার ক্ষত সৃষ্টি হওয়ায়। বরফের একটা কঠিন আস্তরণে নাক থেকে চিবুক পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে। শুধু শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্যে যা একটা ফুটো দেখা যাচ্ছে বরফের মধ্যে। এই ফুটোর মধ্যে দিয়ে ও খৈনি খেয়ে থুতু ফেলছে। তামাক পাতার রস গড়িয়ে গড়িয়ে জমাট বেঁধে একটা খয়েরি রঙা ছুঁচোলো দাড়ি তৈরি হয়ে গেছে।

বোবার মতো লোকটি মাথা নাড়ে। চোখ দুটোয় কৌতুকের হাসি। বাকশক্তি ফিরে পাবার জন্যে স্টোভটার কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ায়। মুখের বরফটা গলিয়ে নেওয়া দরকার। বরফ মুক্ত হবার প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করবার জন্যে আঙুল দিয়ে খুঁটে আধগলা বরফের কুচিগুলোকে টেনে ফেলে দেয়। বরফ কুচি স্টোভের ওপর পড়া মাত্র ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে শব্দ হয়।

'আমার কিছুই হয় নি।' শেষপর্যন্ত লোকটি ঘোষণা করল। 'তবে এখানে যদি কোনো ডাক্তার থাকে তো খুবই উপকার হবে। লিটল্ পেকোতে একজন লোক খুব অসুস্থ। আসলে একটা চিতাবাঘের সঙ্গে একেবারে হাতাহাতি লড়াই করতে হয়েছিল। নখের আঁচড়ে কামড়ে একেবারে শোচনীয় অবস্থা।'

'কত দূরে?' ডাক্তার লিন্ডে জানতে চাইল।

'কত আর, এই একশো মাইল হবে।'

'কতদিন আগে হয়েছে?'

' তিন দিন হল। আসতে আসতেই তিন দিন কেটে গেছে।'

'অবস্থা কি খুবই খারাপ?'

'কাঁধের হাড় সরে গেছে। পাঁজরার কয়েকটা হাড় তো নিশ্চয় ভেঙেছে। ডান হাতটাও ভাঙা। মুখটুকু বাদে সারা শরীর নখের আঁচড়ে ফালা ফালা, একেবারে হাড় অবধি পৌঁছে গেছে। নেহাত উপায় নেই তাই কয়েকটা ক্ষত আমরাই সেলাই করে দিয়েছি আর শিরাগুলো সুতো দিয়ে বেঁধে দিয়েছি।'

'ব্যাস—কম্মো সেরেছো!' অবজ্ঞা ভরে বলে উঠল লিন্ডে। 'ক্ষতগুলো কোন জায়গার?'

'পেটের।'

'তার মানে যে অবস্থা করে রেখেছ, বুঝতেই পারছি।'

'মোটেই না। সেলাই করার আগে পোকা মারা ওষুধ দিয়ে জায়গাগুলো পুরো পরিষ্কার করেছি। সাময়িকভাবে একটা জোড়াতালি দেওয়া আর কি! লিনেন সুতো ছাড়া আর কিছুই তো ছিল না। তাও আমরা পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি।'

'স্বচ্ছন্দে ধরে নিতে পার ওর মৃত্যু অবধারিত।' ক্রুদ্ধ ডাক্তার তাস নাড়তে নাড়তে অভিমত প্রকাশ করে।

'মোটেই না। ও মরবার লোক নয়। জানে, আমি ডাক্তার খুঁজতে এসেছি, যতক্ষণ না

তুমি গিয়ে পৌঁছুচ্ছো ঠিক বেঁচে থাকবে। নিজেকে ও মরতে দেবে না। আমি তো ওকে চিনি।'

'ধর্মবিশ্বাস বনাম পচা-ধরা ক্ষত, অ্যাঁ?' ডাক্তার বিদ্রূপ করল। 'যাকগে, আমি এখানে ডাক্তারি করতে আসি নি। আর একটা মরা মানুষকে দেখতে যাবার জন্যে একশো মাইল পায়ে হেঁটে যাবারও কোনো ইচ্ছে নেই।'

'মানুষটা মরে নি তাই যেতেও তোমার ইচ্ছে হবে।'

লিন্ডে ঘাড় নাড়ে। 'নাহে—বৃথাই তুমি এতদূর এসেছ। বরং রাত্তিরটা এখানে কাটিয়ে যাও।'

'না। তোমাকে নিয়ে আর দশ মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব।'

'তুমি ভাবছ কী করে, যে আমি যাবই?' লিন্ডে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে।

উত্তরে টম ড' যে বক্তৃতাটি ঝাড়ে সেটি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

'তোমার যদি মনস্থির করতে সাত দিনও লাগে তবু তুমি না পৌঁছানো পর্যন্ত ও মরবে না। তাছাড়া ওর পাশে ওর বৌ আছে। চোখে তার এক ফোঁটা জল নেই, কোনো কান্নাকাটির বালাই নেই। তুমি না পৌঁছনো পর্যন্ত ওর বৌ ওকে ঠিক বাঁচিয়ে রাখবে। দারুণ ভাব ওদের মধ্যে। তাছাড়া ওর বৌয়ের মনের জোরও কিছুমাত্র কম নয়। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। লোকটা যদি দুর্বল হয়ে পড়ে ওর বৌ-ই তখন নিজের প্রাণটা পুরো দেবে ওর দেহে। ঠিক বাঁচিয়ে রাখবে। অবশ্য ও যে ভেঙে পড়বে না সে বিষয়ে আমি বাজি ধরতেও রাজি। তুমিও নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আমি তোমার চ্যালেঞ্জ করছি, তুমি পৌঁছে দেখবে ও ঠিক বেঁচে আছে। না যদি হয়, তুমি যা বাজি ধরবে ধর, তার তিনগুণ ওজনের সোনা আমি তোমায় ফিরিয়ে দেব। তীরের ধাবে আমার কুকুরের পাল অপেক্ষা করছে। দশ মিনিটের মধ্যে তোমার বেরিয়ে পড়া উচিত। যেতে তিন দিনের বেশি লাগবে না কারণ আমার আসার সময়েই বরফ কেটে রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি তাহলে, কুকুরগুলোকে দেখা দরকার। দশ মিনিট বাদেই তুমি আসছ কিন্তু।'

টম ড' টুপি টেনে কান ঢাকা দিয়ে হাতে পশমি দস্তানা গলিয়ে বেরিয়ে গেল।

'হতভাগা কোথাকার!' বন্ধ দরজার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লিন্ডে।

দুই

সেদিন রাত্রে অন্ধকার ঘনিয়ে আসার বেশ কিছুক্ষণ পরে টম ড' আর লিন্ডে তাদের ছাউনি ফেলল। পঁচিশ মাইল পথ পিছনে ফেলে এসেছে তারা। ছাউনিটা সাদাসিধে হলেও যথোপযুক্ত। বরফের ওপর আগুন জ্বলছে, তার পাশেই স্প্রুসের ডাল দিয়ে তৈরি মাদুরের একক শয্যার ওপর বিছানো হয়েছে ওদের লোমশ কম্বল দুটো। শয্যার পিছনে তেরছা করে খাটানো ক্যানভাসের টুকরোটা তাপ প্রতিফলিত করবে। ড' কুকুরদের খেতে দিয়ে বরফ আর জ্বালানি কাঠ টুকরো করল। লিন্ডে হাঁটু গেড়ে বাঁধতে বসেছিল, তুষারক্ষত হওয়ায় গাল দুটো খুব জ্বালা করছে। পেট ভরে খেয়ে তারা পাইপ ধরাল, তারপর আগুনের সামনে মোকাসিন জুতো শুকোতে শুকোতে গল্পগুজব হল খানিকটা। শোওয়া মাত্র গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল দু'জনে। ক্লান্ত ও সুস্থ মানুষের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।

সকালে উঠে দেখা গেল অস্বাভাবিক শৈত্যপ্রবাহে ছেদ পড়েছে। লিন্ডের আন্দাজমতো

তাপমাত্রা এখন হিমাঙ্কের পনেরো ডিগ্রি নিচে, আরো কমে আসবে ঠাণ্ডা। ড' চিন্তিত হয়ে পড়ে। আজই ওদের ক্যানিয়নে পৌঁছবার কথা। দুশ্চিন্তার কারণটা বুঝিয়ে বলে ড'। বসন্ত কাল এসে গেলে বরফ গলে ক্যানিয়নের মাঝ দিয়ে জল বইতে শুরু করবে। ক্যানিয়নের দেওয়ালগুলোর উচ্চতা শতসহস্র ফুট। আরোহণ হয়ত করা যাবে কিন্তু চলার গতি হবে মন্থর।

সেদিন সন্ধ্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ভীতিপ্রদ গিরি খাতের মধ্যে সুরক্ষিতভাবে ছাউনিটা ফেলার পর পাইপ ধরিয়ে বসে দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছিল। বড্ড গরম পড়ে গেছে। দুজনেরই মতে তাপমাত্রা এখন শূন্যের ওপরে। গত ছমাসের মধ্যে এই প্রথম।

'এত উত্তরের দিকে চিতাবাঘ দেখা যায় বলে কেউ কখনও শোনে নি।' ড' বলে চলে। 'রুশির ভাষায় জন্তুটার নাম 'কাউগার।' আমি কিন্তু আমাদের দেশে, ওরিগনের কাস্কি প্রদেশে এরকম জন্তু অনেক শিকার করেছি। সে যাই হোক, যদি বাঘ বলেও ধরে নিই, এত বড় বাঘ আমি জীবনে কখনও দেখি নি। একেবারে রাক্ষুসে চেহারা। কী করে যে নিজেদের অঞ্চল ছেড়ে এতদূরে এসে পড়ল, সেটাই একটা প্রশ্ন।'

লিন্ডে কোনো মন্তব্য করল না। দুটো কাঠির মাথায় রাখা তার মোকাসিন থেকে বাষ্প উঠছে। জুতোর দিকে কারোর নজর নেই। সেঁকবার জন্যে উল্টেও দেয় নি। কুকুরগুলো কুণ্ডলি পাকিয়ে এক একটা লোমের ঢেলার মতো বরফে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ চটপট্ করে একটা জ্বলন্ত কাঠ ফাটার শব্দে এতক্ষণের গভীর নীরবতা যেন আরো স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল। ঘুম ভেঙে চমকে উঠে বসে ড'য়ের দিকে তাকাল লিন্ডে। ড'-ও ঘাড় নেড়ে লিন্ডের দিকে চাইল। দুজনেই কান খাড়া করে শুনছে। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা একটা অস্পষ্ট কলরব ক্রমশ প্রচণ্ড গর্জন হয়ে ওঠে। গর্জন ক্রমশই নিকটবর্তী হয়, ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে, পাহাড়ের শিখরে শিখরে, ক্যানিয়নের গহ্বরে গহ্বরে নেচে নেচে বেড়ায়। অরণ্যভূমি এবং গিরিখাতের গায়ে ফাটলের মধ্যে গজানো স্বল্পসংখ্যক পাইন গাছগুলোও তার দাপটে মাথা নত করে। ওরা বুঝতে পারে তীব্রবেগে উষ্ণ বাতাস বইছে, ঘূর্ণিঝড় উঠছে। অগ্নিকুণ্ড থেকে ফুলকির ফোয়ারা ছড়িয়ে পড়ছে। কুকুরগুলো ঘুম ভেঙে উঠে সামনের পায়ে ভর রেখে বসেছে। হিম শীতল নাকগুলো আকাশের দিকে উঁচু করে হু-হু-শব্দে নেকড়ের মতো একটানা ডাক ছাড়ছে।

'এবার চিনুক ধরতে হবে।' ড' বলল।

'তার মানে নদীর পাশের রাস্তা তো?'

'হ্যাঁ। পাহাড়ি পথে এক মাইল পেরোনো অনেক সহজ।' প্রায় মিনিটখানেক লিন্ডেকে ভালোমতো লক্ষ্য করার পর বাতাসের গর্জনের ওপর গলা চড়িয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ড' বলল, 'এ পর্যন্ত আমরা পনের ঘণ্টা হেঁটেছি।' আবার একটু অপেক্ষা করে ড' শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, 'কী মনে হচ্ছে ডাক্তার, পারবে তো শেষপর্যন্ত?'

উত্তর হিসেবে লিন্ডে তার পাইপের আগুন ঝেড়ে নিভিয়ে দিল। ভিজে মোকাসিনগুলো টেনে নিয়ে শুরু করে দিল পরতে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুজনে মিলে প্রচণ্ড বাতাসের দাপট অগ্রাহ্য করে কুকুরদের তৈরি করে নিল লাগাম পরিয়ে। ছাউনি গুটিয়ে লোমশ কম্বল আর রান্নার সাজসরঞ্জামগুলো স্টোভের পিঠে বাঁধা হল। অন্ধকারের মধ্যেই এবার যাত্রা শুরু করল ওরা। প্রায় এক সপ্তাহ আগে এই পথ দিয়েই ড' এসেছে। সারারাত ধরে গর্জনে মুখরিত হয়ে রইল চিনুক। ক্লান্ত কুকুরগুলোকে যেমন তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে তেমনি নিজেদের দেহের অবশ মাংস পেশিগুলোকেও সচল রাখার জন্য কম মেহনত

করতে হয় নি ! আরো বারো ঘ পর প্রাতরাশ সারবার জন্যে ওরা থামল। নাগাড়ে সাতাশ ঘণ্টা হেঁটেছে।

বেশ কয়েক পাউন্ড বেকন দিয়ে ভাজা হরিণের মাংস গলধঃকরণ করার পর ড' বলল, 'এবার এক ঘণ্টা ঘুম।'

সঙ্গীকে দুঘণ্টা ঘুমোবার সুযোগ দিল ড'। নিজে সাহস করে চোখের পাতা এক করতে পারে নি ! কোমল বরফের স্তরের ওপর আঙুলের আঁচড় কেটে সময় কাটিয়েছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বরফের স্তরের উচ্চতা ক্রমশ কমে আসছে। দুঘণ্টার মধ্যে তিন ইঞ্চি নিচে নেমে গেছে। বসন্ত বাতাসের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে অস্পষ্টভাবে অথচ খুব কাছ থেকেই কানে আসছে অলক্ষ্যে প্রবাহিত জলস্রোতের শব্দ। অগুন্তি জলধারা পুষ্ট লিটল্ পেকো নদী বরফের নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

লিন্ডের কাঁধে হাত রেখে তাকে জোরে জোরে ঝাঁকাতে শুরু করল ড'।

'ডাক্তার ! ও ডাক্তার ! একটু চেষ্টা করে দেখ, ঠিক আরেকটু হাঁটতে পারবে, নিশ্চয় পারবে।'

নিদ্রায় ভারি চোখের পাতার তলায় ডাক্তারের ক্লান্ত কালো চোখ দুটো একবার সাড়া দিয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

'ডাক্তার ! শুনছ—নখের আঁচড়ে একেবারে ছিঁড়েখুঁড়ে পড়ে আছে রকি। আগেই তো বলেছি, কোনোরকমে আমি ওর পেট সেলাই করেছি...ডাক্তার—' আবার ডাক্তারের চোখ দুটো বুঁজে আসতেই ঝাঁকানি দেয় ড'। 'শুনছ ডাক্তার, আরেকটু হাঁটতে পারবে কি? শুনতে পাচ্ছ, কী বলছি? আরেকটু হাঁটতে পারবে না?'

লাথি মেরে ক্লান্ত কুকুরগুলোর ঘুম ভাঙানো মাত্র সবকটা দাঁত খিঁচিয়ে গরগর করে ওঠে। এখন ওরা মন্থর গতিতে এগোচ্ছে। ঘণ্টা পিছু দুমাইলের বেশি নয়। সুযোগ পেলেই কুকুরগুলো ভিজে তুষারের ওপর শুয়ে পড়ছে।

'আর কুড়ি মাইল এগোলেই গিরিখাতে পৌঁছে যাব।' ড' উৎসাহ দেয়। 'তারপর আর বরফের হাঙ্গামা নেই। আমরা পাড়ের ওপর উঠে আসব। ওখান থেকে দশ মাইল এগোলেই রকিদের শিবির। বলতে গেলে তো পৌঁছেই গেছি। রকির একটা ব্যবস্থা করে ফেরবার সময় তুমি নৌকোয় চড়েই আসতে পারবে। একদিনে ফিরে আসবে।'

তুষারের ওপর পায়ে হাঁটা কিন্তু ক্রমশই দুরূহ হয়ে উঠছে। জমাট নদীর কিনারা থেকে খসে খসে পড়ছে বরফের চাঙড় আর যেখান থেকে খসে পড়ছে না, সেখানে জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে। জলের মধ্যে ছপ ছপ করে পা ভিজিয়ে এগোতে হচ্ছে ওদের। কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে লিটল্ পেকো। চারধারেই বরফের ওপর ফাটল আর গর্ত দেখা দিচ্ছে। এখন এক একটা মাইল হাঁটা, সমতলে দশ মাইল হাঁটার সমান।

'স্লেজের ওপর চড়ে বস ডাক্তার। জিরিয়ে নাও একটু।' ড' আহ্বান জানাল।

প্রত্যুত্তরে কালো াখের জ্বলন্ত চাউনি তাকে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করার সুযোগ দিল না।

দুপুর না হতেই আসন্ন অমঙ্গলের কথা স্পষ্ট টের পেল ওরা।

নদীর তুষারাবৃত বুকের ওপর দাঁড়িয়েই ওরা স্পষ্ট টের পাচ্ছে যে অন্তঃসলিলা খর জলস্রোতের সঙ্গে ভেসে আসা তুষারের চাঙড়গুলো গুমগুম শব্দে আঘাত হানছে। শঙ্কাপীড়িত কুকুরগুলো নাকে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। পাড়ের ওপর উঠে আসতে চাইছে

তারা।

'বোঝা যাচ্ছে যে সামনেই নদীর বুকের ওপর দিয়ে জল বইছে।' ড' বোঝাতে শুরু করল। 'এক্ষুনি কোথাও না কোথাও জলস্রোতে বাধা পড়বে, আর অমনি একশো মিনিটে একশো ফিট লাফিয়ে উঠবে নদীর জল। ওপরে ওঠার একটা পথ পেলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে যাওয়া উচিত। এস এস, আর দেরি নয়। ভেবে দেখ, এমনিতে এই ইউকোনও সপ্তার পর সপ্তা কেমন জমাট বেঁধে পড়ে থাকে।'

ক্যানিয়নের এই অংশটা অত্যন্ত সংকীর্ণ। দুপাশের বিশাল দেওয়াল এত খাড়া যে ওপরে ওঠার কোনো উপায় নেই। বাধ্য হয়ে ওরা নদীর বুক ধরেই এগিয়ে চলল। তারপর সহসাই নেমে এল বিপর্যয়। অভিযাত্রী দলটির ঠিক মধ্যবর্তী অংশের পায়ের তলার জমাট বরফ সশব্দে বিস্ফোরিত হল। দড়িবাঁধা সারিবদ্ধ কুকুরদের মধ্যে মাঝখানের দুটো পড়ে গেল বরফভাঙা গর্তে। ডুবন্ত কুকুর দুটোকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল জলের তীব্র প্রবাহ আর সেই সঙ্গে দড়িতে টান পড়ে সামনের কুকুরটাকেও পিছনে টেনে এনে গর্তের মধ্যে ফেলে দিল। ডুবন্ত কুকুর তিনটের আকর্ষণ ক্রন্দনরত পিছনের কুকুর দুটোকেও ক্রমশ গর্তের দিকে টেনে আনল। ওরা দুজনে প্রাণপণ শক্তিতে স্লেজগাড়িটাকে চেপে ধরেছে কিন্তু আটকাতে পারছে না। ওদেরও টেনে নিয়ে চলেছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে গেছে ব্যাপারটা। চকিতে ছুরির এক কোপে স্লেডে বাঁধা কুকুরটার দড়ি কেটে দিল ড'। মুহূর্তে মধ্যে কুকুরটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গর্তের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার দুজনে মিলে স্লেজটাকে টেনে এনে পাড়ের ওপর একটা ফাটলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তারপর চোখের সামনেই দেখল বরফের উপরিস্তর ভেঙে এক নাগাড়ে ধ্বসে পড়ছে চাঁইচাঁই বরফ।

মাংস আর শোবার লোমওলা কম্বলগুলো শুধু গাঁটরি বেঁধে নিয়ে স্লেজটাকে ওরা পরিত্যাগ করল। লিন্ডে চায় নি ড' সবচেয়ে ভারি বোঝাটা বহন করুক, কিন্তু ড'-এর জেদই বজায় থাকল।

'ভুলে যেও না ওখানে পৌঁছেই তোমাকে কাজে হাত লাগাতে হবে। চল, চল—'

দুপুর একটার সময় ওরা আরোহণ শুরু করে যখন ওপরে এসে উঠল তখন রাত আটটা। সমতল ভূমিতে পা দিয়েই দুজনে লুটিয়ে পড়ে জমির ওপর। একটি ঘণ্টা শুধু শুয়েই কাটিয়ে দিল। তারপর আগুন জ্বালল, কফি তৈরি হল, প্রচুর পরিমাণে মাংস গলধঃকরণ করল। অবশ্য প্রথমেই লিন্ডে দুজনের বোঁচকা দুটো হাতে তুলে পরীক্ষা করে দেখেছে যে ড'-এরটা তার চেয়ে দুগুণ ভারি।

'সত্যি তুমি লোহার মানুষ ড'!' ডাক্তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। 'আমাকে বলছ? দূর-দূর-দাঁড়াও না রকির সঙ্গে আগে দেখা হোক। খাঁটি ইস্পাত দিয়ে তৈরি—কিংবা প্ল্যাটিনাম বা সোনা, যা খুশি বলতে পার। আমি পর্বতারোহী কিন্তু তবু আমাকে ও হেসেখেলে কাবু করে দেয়। দেশে থাকতে কারি প্রদেশে যখন ভাল্লুক শিকারে যেতাম, আমার সঙ্গীদের ছুটিয়ে নাজেহাল করে ছেড়ে দিতাম। প্রথম যেদিন এখানে এসে রকির সঙ্গে ভাল্লুক শিকারে বেরোই, মাথায় বদমাইশি চাপল। ভাবলাম ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া যাক। হাতের শেকল ঢিলে দিয়ে কুকুরগুলোকে ছোটাতে শুরু করলাম। একটু পরে দেখি রকিও এসে হাজির হয়েছে। কত আর ছুটবে এভাবে, আবার ঢিলে দিলাম শেকল। এবার এক ঘণ্টা ছোটার পরেও দেখি যথারীতি আমার পিছনেই রয়েছে রকি। বোকা বনে গিয়ে বললাম, 'এবার তুমি বরং আমার সামনে সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।' রকি পথ দেখিয়ে এগোতে শুরু করে দিল সঙ্গে সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত ওর সঙ্গ ছাড়ি নি, কিন্তু সত্যি

বলছি, ভাল্লুকের দেখা না পাওয়া পর্যন্ত নাকানিচোবানি খাইয়েছিল।

'রকিকে কেউ আটকে রাখতে পারে না। শরীরে ওর ভয় বলে কোনো বস্তু নেই। গত বছর শরৎকালে একদিন ও আর আমি সন্ধের মুখে শিবিরে ফিরছি, তখনো বরফ জমতে শুরু করে নি। ওর কাছে শুধু একটা কার্তুজ আছে আর আমার হাত একেবারেই ফাঁকা। এমন সময় কুকুরগুলো একটা মাদি গ্রিজলি ভাল্লুককে ঠাহর করল। ভাল্লুকটা ছোটই ছিল। মাত্র তিনশো পাউন্ডের মতো ওজন। কিন্তু তুমি তো জানো, গ্রিজলিগুলো কীরকম হয়। 'খবরদার, গুলি কর না!' বন্দুক উঁচু করতেই রকিকে নিষেধ করলাম। 'মাত্র একটাই গুলি আছে, তাছাড়া এত অন্ধকারে লক্ষ্য স্থির করা যাবে না।'

'তুমি গাছে চড়ে বস।' রকি বলল। গাছে আমি অবশ্য চড়ি নি কিন্তু ভাল্লুকটা যখন গুলি খেয়েও টলতে টলতে গজরাতে গজরাতে কুকুর পালের দিকে তাড়া করে এসেছিল, সত্যিই তখন ভেবেছিলাম যে গাছে চড়ে বসে থাকলেও ভালো করতাম। সে এক কাণ্ড। অবস্থা আরো ঘোরালো হয়ে উঠল ভাল্লুকটা যখন বিরাট এক গাছের গুঁড়ির আড়ালে একটা গর্তে ঢুকে বসল। কুকুরগুলোর পক্ষে গুঁড়ির নিচের দিক দিয়ে ভাল্লুকটাকে আক্রমণ করার কোনো উপায় ছিল না। এদিকে এপাশ থেকে ভাল্লুকের ওপর লাফিয়ে পড়া মাত্র এক এক থাবায় এক একটাকে খতম করে দিচ্ছে। চারদিকে শুধু ঝোপঝাড়, ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসছে, একটাও গুলি নেই—কিচ্ছু করার উপায় নেই।

'তখন রকি কী করল জানো? গুঁড়ির নিচের দিকে গিয়ে আড়াল থেকে হাত বাড়িয়ে ছুরি চালাতে আরম্ভ করল। একবার, দুবার, তিন বার ছুরি বসাল কিন্তু শুধু চামড়া অবধি পৌঁছুচ্ছে ছুরিটা। ওদিকে একের পর এক কুকুরগুলো সাবাড় হয়ে যাচ্ছে। মরিয়া হয়ে উঠল রকি।

'কুকুরগুলোকে এভাবে মরতে দেওয়া যায় না। এক লাফে গুঁড়ির ওপর চড়ে ভাল্লুকটার লেজ ধরে পিছন দিকে ঝুঁকে পড়ল ও। টানের চোটে ভাল্লুক, কুকুর আর রকি সবাই মিলে গড়িয়ে পড়ল ঢালু পাড়ের ওপর থেকে বিশ ফুট নিচে নদীর জলে। সে কী চিৎকার, গজরানি আর আঁচড়াআঁচড়ি। জলে পড়ে যে যেদিকে পারলো সাঁতরে উঠল। না, ভাল্লুকটাকে ধরতে পারে নি রকি, কিন্তু কুকুরগুলোর তো প্রাণ বাঁচাল। এই হচ্ছে রকি। একবার যদি মনস্থির করে ফেলে কারোর সাধ্য নেই ওকে আটকায়।'

চলতি পথের পরবর্তী ছাউনি তৈরি করার পর লিন্ডে বসে বসে শুনতে লাগল রকির আহত হবার কাহিনী।

'সেদিন আমাদের শিবির থেকে মাইল খানেক দূরে বনের মধ্যে গিয়েছিলাম! কুড়ুলের হাতল বানাবার জন্যে একটা বার্চ গাছের ডালের দরকার পড়েছিল।

ফিরে আসছি, হঠাৎ কানে এল দারুণ হট্টগোল—চেঁচামেচি। এই জায়গাটাতেই আমরা একটা ভাল্লুক ধরার ফাঁদ পেতেছিলাম। একটা পুরোনো ঝুড়ির মধ্যে কোনো শিকারি এই ফাঁদটা ফেলে গিয়েছিল। দেখতে পেয়ে রকিই পেতেছিল ফাঁদটাকে। শুনতে পেলাম পালা করে রকি আর তার ভাই হ্যারি একবার করে চিৎকার করছে, তারপরেই আবার হাসছে। মনে হল যেন কোনো খেলা চলছে। কিন্তু খেলাটা কী শুনলে মাথা তোমার গরম হয়ে যাবে। কারি প্রদেশেও অনেক আহাম্মুককে দেখেছি বীরত্ব দেখাবার জন্য যা নয় তাই করছে। কিন্তু রকিরা যে কাণ্ড বাধিয়েছিল তার পাশে সে তো ছেলেখেলা। ফাঁদে আটকা পড়ে একটা চিতাবাঘ হুঙ্কার করছে আর ওরা একটা সরু গাছের ডাল হাতে নিয়ে পালা করে জন্তুটার নাকের ওপর বাড়ি মারছে। কিন্তু শুধু এটুকু হলেও তো ভালো ছিল। ঝোপের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেই দেখি হ্যারি গাছের ডালটা দিয়ে বাড়ি মারার পর

ডালটা থেকে ছইঞ্চি ভেঙে নিয়ে অবশিষ্টটুকু গুঁজে দিল রকির হাতে। এবার বুঝতে পারছ? ওরা একবার করে বাড়ি মারছিল আর ডালটাকে ভেঙে ছোট করে নিচ্ছিল। শুনতে যতটা সোজা লাগছে ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। চিতাটা পিঠ কুঁজো করে, গুড়ি মেরে, পিছনে সরে, অত্যন্ত তৎপর ভঙ্গিতে আঘাত এড়াতে চাইছিল। তাছাড়া কখন যে সামনে ঝাঁপ মারবে তাও বোঝা দুষ্কর। আরো অদ্ভুত ব্যাপার চিতাটার পিছনের একটা পা শুধু ফাঁসে আটকা পড়েছিল। সে ফাঁসটাও বেশ ঢিলেই ছিল নিশ্চয়!

'দুঃসাহসের খেলায় মেতে উঠেছিল দুজনে। কাঠিটা একটু একটু করে ছোট হচ্ছে আর চিতাটাও ক্রমশই আরো ক্ষেপে উঠছে। দেখতে দেখতে কাঠিটা প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল। মাত্র চার ইঞ্চি পরিমাণ অবশিষ্ট রয়েছে—এবার রকির পালা। হ্যারি বলল, 'এবার রণে ক্ষান্ত দাও, বুঝলে?' রকি রাজি হয় না, 'ক্ষান্ত দেব কেন?' হ্যারি উত্তর দিল, 'কারণ এবার তুমি মারার পর আমার জন্যে আর কাঠি বলে কিছু থাকবে না।' রকি হাসতে হাসতে বলল, 'তখন তোমাকেই হার স্বীকার করতে হবে। আমি কেন হার মেনে নেব!' রকি চার ইঞ্চি কাঠি হাতে এগিয়ে গেল।

'সত্যি ডাক্তার, জীবনে যেন আর কখনও এমন দৃশ্য না দেখতে হয়। বাঘটা পিছু হটে, পিঠ কুঁজো করে ওত পেতেছিল। সোজা হলেই সামনে ছফুট জায়গা থাবার মধ্যে পাবে। ওদিকে রকির কাঠি চার ইঞ্চি লম্বা। বাঘটা সত্যিই ঝাঁপিয়ে পড়ল রকির ঘাড়ে। এমন জাপটাজাপটি লেগে গেল যে গুলি চালালে দুজনেই মরবে। হ্যারিই শেষ পর্যন্ত ছুরি চালিয়ে চিতাটার পেট ফাঁসাল।'

'আগে যদি জানতাম এইভাবে জেনেশুনে ও এই কাণ্ড করেছে, কক্ষনো আসতাম না।' সব শোনার পর ডাক্তার মন্তব্য করল।

ড' বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে বলে, 'রকির বৌ-ও তাই বলেছিল। কীভাবে কী হয়েছে, এসব কথা বলতেই বারণ করে দিয়েছিল।'

'লোকটা কি পাগল নাকি?' বিস্মিত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জানতে চাইল ডাক্তার।

'ওরা সবাই পাগল। দুটো ভাই সারাক্ষণ এ-ওর পিছনে লেগে আছে। খালি বাহাদুরি দেখানো নিয়ে রেষারেষি। এই তো গত বছর শরৎকালে, সেদিন দারুণ দুর্যোগ—খাল দিয়ে দুর্বার বেগে জল বয়ে যাচ্ছে, বরফের চাঙড় ভেসে চলেছে—দুভাই বাজি ধরে নেমে পড়ল সাঁতার কাটতে। এমন কোনো কাজ নেই যা ওরা করতে পারে না। রকির বৌও বাদ যায় না। রকি বারণ না করলে যেন কাজ নেই যা করতে পারে না। রকি কিন্তু ওর বৌকে মোটামুটি সামলে সামলে রাখে। শিবিরের কোনো কাজ করতে দেয় না। সেইজন্যেই তো আমাকে আর আরেকজনকে ভালো মাইনে দিয়ে রেখেছে। অর্থের ওদের অভাব নেই। দুজনে দুজনের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে। গত বছর শরতকালে ওরা প্রথম এই জায়গাটায় এসেছিল। চারদিকে একবার তাকিয়েই রকি বলেছিল, 'মনে হচ্ছে প্রচুর শিকার মিলবে।' হ্যারিও সঙ্গে সঙ্গে রায় দিয়েছিল, 'বেশ তো, এখানেই তাহলে শিবির বসানো যাক।' আমি কিন্তু ভেবেছিলাম ওরা নিশ্চয় সোনার খোঁজে এসেছে। পরে দেখলাম সারা শীতকাল কেটে গেল, সোনা নিয়ে ওদের কোনো মাথাব্যথা নেই।'

লিন্ডের রাগ আরো বাড়ে, 'মূর্খদের জন্যে আমারও কোনো মাথাব্যথা নেই। এখন ফিরতে পারলেই বাঁচতাম।'

'না ডাক্তার, না—'ড' ওকে আশ্বস্ত করতে চায়। 'ফিরে যাবে কী করে, খাবার কোথায়? তাছাড়া কালই আমরা পৌঁছে যাব। শেষ নদীটা পেরোলেই তো ওদের কেবিন।

সব কিছু বাদ দিলেও মনে রেখ, তুমি এখন তোমার ঘাঁটিতে নেই, চাইলেও আমি তোমাকে যেতে দেব না।'

ক্লান্ত হলেও লিন্ডের কালো চোখ দুটো ঝলসে উঠে ড'কে সতর্ক করে দিল। বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ড' হাত বাড়িয়ে ডাক্তারের হাতটা চেপে ধরল।

'আমারই অন্যায় ডাক্তার। কিছু মনে কর না। অতগুলো কুকুর খোয়া গেল, মাথা কি আর ঠিক আছে!'

একদিন নয়, তিন তিন দিন পরে ওরা দুজনে পৌঁছতে পারল। পাহাড়ের মাথায় হঠাৎ তুষার ঝড়ে আটকে পড়েছিল। ক্লান্ত পায়ে ওরা এগিয়ে এল কেবিনের দিকে। গর্জনরত লিটল পেকো নদীর ধারে পেটমোটা কেবিনটা যেন থেবড়ে বসে আছে। উজ্জ্বল সূর্যালোক থেকে অন্ধকার ঘরে পা দিয়ে লিন্ডে প্রথমটা ঘরের বাসিন্দাদের তেমন ঠাহর করতে পারে নি। শুধু দুটি পুরুষ আর একটি নারীর অস্তিত্ব টের পেয়েছে। ওদের সম্বন্ধে অবশ্য তার কোনো আগ্রহ নেই। সোজা এগিয়ে গেল সে বাঙ্কের দিকে, যেখানে আহত লোকটি শুয়ে আছে। চিত হয়ে চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। লিন্ডে লক্ষ্য করল লোকটির ভুরুগুলো পেনসিলের সরু রেখার মতো, মাথার খয়েরি চুলগুলো যেন রেশমের সুতো। পেশিবহুল সুদৃঢ় ঘাড়ের ওপর রোগা মুখটা বড্ড বেমানান লাগছে। তবু রুগ্ন মুখেও সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ অবয়বের স্বাতন্ত্র্য লোপ পায় নি।

'ড্রেসিং করেছ কী দিয়ে?' মেয়েটিকে প্রশ্ন করে ডাক্তার।

'করোসিভ সাবলিমেট, রেগুলার সলিউশান।' উত্তর দিল মেয়েটি।

ডাক্তারের চকিত দৃষ্টি এসে বিদ্ধ করল মেয়েটিকে। পর মুহূর্তেই সে আহত লোকটির দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছিল মেয়েটির। এবার জোর করে দম চেপে ধরেছে। লিন্ডে এবার ঘরের পুরুষ বাসিন্দাদের দিকে তাকাল।

'তোমরা এখন যেতে পার। কাঠ-টাঠ কাটোগে যাও।'

ওদের মধ্যে একজন অসন্তুষ্টভাবে গজগজ করে ওঠল।

'কেসটা খুব সিরিয়াস।' লিন্ডে বুঝিয়ে বলল, 'আমি ওর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'আমি ওর ভাই।' একটি লোক বলল।

মেয়েটি এবার অনুনয়ের দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকাতেই ঘাড় নেড়ে অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে লোকটি দরজার দিকে পা বাড়াল।

'আমাকেও যেতে হবে?' বেঞ্চের ওপর থেকেই প্রশ্ন করল ড'। এসেই গড়িয়ে পড়েছিল।

'হ্যাঁ—যাও এখন।'

কেবিন খালি না হওয়া অবধি ডাক্তার লোক দেখানো ভঙ্গিতে রুগীকে পরীক্ষা করার ভান করে গেল।

'তাহলে এই তোমার রেক্স স্ট্যাণ্ড!' ঘর খালি হতে ডাক্তার বলল।

মেয়েটি বাঙ্কের ওপর শায়িত লোকটির দিকে দৃষ্টি ফেরাল। যেন নিজেকে আশ্বস্ত করতে চাইছে যে এই লোকটাই রেক্স স্ট্যাণ্ড। নীরবতা ভঙ্গ না করেই এবার সে লিন্ডের দিকে তাকাল।

'কথা বলছ না যে?'

মেয়েটি অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'কী লাভ? তুমি তো জানো ওই রেক্স স্ট্যাণ্ড।'

'ধন্যবাদ। তবু তোমাকে মনে করিয়ে না দিয়ে পারছি না যে এই প্রথম আমার ওকে দেখার সৌভাগ্য হল। বস বস।' আঙুলে করে টুলটা দেখিয়ে দিয়ে নিজে বেঞ্চটার ওপর বসে পড়ল। 'একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছি। ইউকন থেকে এখানে আসার কোনো বড়ো রাস্তা নেই।'

একটা পেন্সিল-কাটা ছুরি দিয়ে বুড়ো আঙুল থেকে একটা কাঁটা বের করতে চেষ্টা করছে ডাক্তার।

মিনিটখানেক অপেক্ষা করে মেয়েটি প্রশ্ন করল, 'কী করবে এখন?'

'খাব দাব, বিশ্রাম নেব, তারপর ফিরে যাব।'

'না না, সেকথা নয়। বলছি ওর কী করবে?' অচৈতন্য লোকটির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটি বলল।

'করব আবার কী। কিচ্ছু না।'

বাঙ্কের কাছে এগিয়ে অসুস্থ লোকটির কোঁকড়া চুল ভর্তি মাথাটার ওপর আলতো করে হাত রাখল মেয়েটি।

'তার মানে তুমি ওকে খুন করতে চাও।' ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল। 'তোমার কিছু না-করা মানেই খুন করা, কারণ চেষ্টা করলে তুমি ওকে বাঁচাতে পার।'

'তাই যদি মনে কর তো তাই।' একটু ভাবল লিন্ডে।

তারপর নিষ্ঠুরভাবে হেসে তার চিন্তাটা খোলাসা করল, 'এই হতচ্ছাড়া দুনিয়াটায় সেই আদিমকাল থেকেই তো এই রীতিই প্রচলিত—কেউ বউ চুরি করলে লোকে তাকে মেরেই ফেলে।'

'তুমি কিন্তু অন্যায় কথা বলছো গ্র্যান্ট।' মেয়েটির শান্ত কণ্ঠ। 'তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি স্বেচ্ছায় বেরিয়ে এসেছি। কেউ আমায় বাধ্য করে নি। রেক্স আমায় চুরিও করে নি। তুমিই আমাকে হারিয়েছ। অত্যন্ত খুশি মনে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে আমি ওর হাত ধরে বেরিয়ে এসেছি। আমার আগ্রহের কোনোই ঘাটতি ছিল না। বরং বলতে পার আমিই ওকে চুরি করেছি। আমরা একসঙ্গেই চলে এসেছি।'

'তা বলেছ ভালোই।' লিন্ডে স্বীকার করল। 'তোমার চিন্তা করার স্বভাবটা আজও যায় নি দেখছি। তা ম্যাজ, রেক্সকে তো তাহলে বেশ মুশকিলে পড়তে হয়েছে বল।'

'যে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে, সে ঠিক তেমনি ভালোও বাসে—'

'ঠিক ততটা বোকাও হয় না।' মাঝখান থেকে বলে উঠল লিন্ডে।

'তাহলে তুমি মানছো তো, যে, যা করেছি ভালোই করেছি?'

'দূর—' হার মানার ভঙ্গিতে দুহাত ছুঁড়ল লিন্ডে। 'বুদ্ধিমান মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার এই ঝামেলা। ছেলেরা সব ভুলে যায়, নিজের কথার জালে নিজেই জড়িয়ে পড়ে। তুমি যদি শুধু কথার জাল বুনেই রেক্সকে পাকড়াও করে থাক, তাতেও অবাক হব না।'

এবার ম্যাজের নীল চোখের সরল দৃষ্টি আর আর সারা শরীর যৌবনের যে গর্বে টলমল করে ওঠল সেটাই লিন্ডের কথার উত্তর।

'না ম্যাজ, আমি কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। তুমি নির্বোধ হলেও ওকে পাকড়াতে পারতে। শুধু ওকে কেন, যাকে ইচ্ছে তাকে। তোমার এই সৌন্দর্য, দেহের গড়ন আর বাঁধুনি—আমার তো না জানার কথা নয়! আমিও তো এই একই যন্ত্রে একদিন পেষাই হয়েছি। শুধু হয়েছি বলব কেন, আমার দুর্ভাগ্য যে এখনো আমার ইচ্ছেগুলো মরে নি।'

অস্থির অধৈর্য কণ্ঠে বলে চলল লিন্ডে। ঠিক সেই আগের মতো। ম্যাজ জানে লিন্ডের

কথা মাত্রেই স্বতঃস্ফূর্ত। লিন্ডের শেষ কথাটার খেই ধরল ম্যা

'মনে পড়ে গ্র্যান্ট—জেনেভা লেকের কথা?'

'না পড়ে উপায় কী! বলতে গেলে আমার খুশিগুলো তখন একটা অস্বাভাবিক মাত্রা পেয়েছিল।'

ম্যাজ ঘাড় নাড়ল। চোখগুলো তার জ্বলজ্বল করে ওঠল। 'পুরোনো দিনের খাতির বলেও তো একটা কথা আছে, মানো? প্লিজ গ্র্যান্ট, একটু মনে করে দেখ, সেই পুরোনো দিনগুলো...একটু মনে কর...একটু...আমাদের ভালোবাসার কথা...একজনের আরেকজনকে না হলে কী হত তখন?'

'তুমি কিন্তু অন্যায় সুযোগ নিচ্ছ।' লিন্ডে একটু হেসে তারপর আবার বুড়ো আঙুলটার ওপর আক্রমণ চালাল। কাঁটাটাকে টেনে বের করে ভুরু কুঁচকে খুঁটিয়ে দেখল। শেষ পর্যন্ত রায় দিল লিন্ডে, 'না ম্যাজ না। অত আদর্শবাদী হওয়া আমার ধাতেই নেই।'

'তবু তুমি যে এতদূর পথ এত কষ্ট করে এসেছ সে তো একজন অপরিচিত অসুস্থ মানুষেরই কথা শুনে।' ম্যাজ আশা ছাড়ে না।

লিন্ডের অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট প্রকাশ পায় তার কথার তীব্রতায়, 'তুমি ভাবটা কী? এই লোকটা আমারই বৌয়ের প্রেমিক জানলে তারপর আর এক পাও নড়তাম।'

'সে যাই হোক, এসে যখন পড়েইছ আর ওর এই অবস্থা...কী করবে বল?'

'কিচ্ছু না। কেন করব? আমি কি ওর চাকর? ওই বরং আমার সর্বস্ব লুঠ করেছে।'

ম্যাজ কথা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়ল।

'গেট আউট! শুধু এক বালতি জল এনে দরজার বাইরে রেখে দাও।'

'তাহলে তুমি ওর চিকিৎসা...?' আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলতে শুরু করেছিল ম্যাজ।

'আজ্ঞে না। মুখ হাত পা ধোব।'

বিশুদ্ধ বর্বরতার আঘাতে বিচলিত হয়ে পড়ল ম্যাজ। ঠোঁট দুটো তার শক্ত হয়ে উঠেছে।

'শোনো গ্র্যান্ট।' ম্যাজের কণ্ঠস্বর এখন শান্ত শীতল। আমি কিন্তু তাহলে ওর ভাইকে সব বলে দেব। স্ট্র্যাণ্ডদের আমি চিনি। তুমি যদি পুরোনো দিনের কথা ভুলে যেতে পার, আমিও পারি। তুমি যদি কিছু না কর, হ্যারি তোমাকে খুন করবে। হ্যারি কেন, আমি বললে টম ড'-ও তাই করবে।'

'তুমি তো আমাকে চেনো ম্যাজ, তারপরও ভয় দেখাচ্ছ?' গম্ভীর স্বরে ম্যাজকে ধমক লাগাল লিন্ডে। ব্যাঙ্গের সুরে যোগ করল, 'তাছাড়া আমাকে মারলেও তাতে তোমার রেক্স স্ট্র্যাণ্ডের কী সুবিধে হবে বুঝতে পারছি না।'

ম্যাজের মুখ দিয়ে একটা চাপা গোঙানি বেরিয়ে আসে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে। ম্যাজ দেখে লিন্ডের চকিত দৃষ্টি ওর শিহরণ লক্ষ্য করছে।

'না গ্র্যান্ট, আমি হিস্টিরিয়ার রোগী নই।' ম্যাজ দ্রুতবেগে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বোঝাতে শুরু করে। দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগে। 'কোনোদিন কি দেখেছ আমায় এভাবে? কক্ষনো না। হঠাৎ কি যে হল জানি না, সামলে নিতে পারবো ঠিকই। আসলে মাথার ঠিক নেই। রাগও হয়েছে প্রচণ্ড—তোমার ওপর। সেইসঙ্গে দুর্ভাবনা আর ভয়। ওকে আমি হারাতে চাই না। সত্যিই আমি ওকে ভালোবাসি, গ্র্যান্ট। ও আমার রাজা, আমার মনের মানুষ। একটার পর একটা ভয়ঙ্কর দিনগুলো ঠায় ওর পাশে বসে কেটে গেছে। ও গ্র্যান্ট, প্লিজ—প্লিজ দয়া কর—'

'স্নায়ুর চাপ।' লিন্ডের শুষ্ক মন্তব্য। 'সহ্য করার চেষ্টা কর, ঠিক হয়ে যাবে। ছেলে

হলে বলতাম একটা সিগারেট ধরাও।'

অশক্ত পদক্ষেপে ম্যাক্স সরে এল। টুলের ওপর বসে লিন্ডের দিকে তাকিয়ে রইল। আত্মনিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ফায়ারপ্লেস থেকে একটা ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে। বাইরে নেকড়ে-কুকুর দুটো ঝগড়া বাধিয়েছে। লোমশ কম্বলের নিচে আহত মানুষটার বুকের ওঠাপড়া এখানে বসেই বেশ দেখা যাচ্ছে। ম্যাক্স লক্ষ্য করে লিন্ডের ঠোঁটদুটোয় একটা অপ্রীতিকর হাসি ফুটে উঠছে।

'বলত, ঠিক কতটা তুমি ওকে ভালোবাস?' লিন্ডে প্রশ্ন করল। ম্যাক্সের বুকটা ঘন ঘন ওঠানামা করে। লজ্জাহীন গর্বে ওর চোখ দুটো ঝলসে ওঠে। লিন্ডে ঘাড় নেড়ে জানাল সে তার উত্তর পেয়ে গেছে।

'একটু সময় দাও আমাকে, কেমন?' লিন্ডে বলল। ঘরের চারদিকে একবার দৃষ্টি বোলায়, কীভাবে শুরু করবে ঠিক করতে পারছে না। 'একটা গল্প পড়েছিলাম অনেক দিন আগে। বোধহয় হারবার্ট শ-এর লেখা। গল্পটা বলছি, শোনো। অপূর্ব সুন্দরী এক নারী আর এক সৌন্দর্যপ্রিয় সবল স্বাস্থ্যবান পুরুষের কাহিনী। জানি না, তার সঙ্গে তোমার রেক্স ওয়ার্নারের কতটা মিল। সে যাক, এ লোকটা ছিল চিত্রশিল্পী, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ও ভবঘুরে। কয়েক সপ্তাহ প্রেমের বন্যা বইয়ে, চুমুতে চুমুতে ভাসিয়ে, তারপর হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে গেল লোকটি। মেয়েটি ওকে যেভাবে ভালোবাসত, অনেকটা তোমারই মতো, মানে, আগে তুমি আমায় যেমন ভালোবাসতে আর কি। সেই জেনেভা লেকের মতো। দশ দশটা বছর মেয়েটা শুধু কেঁদে কেঁদেই কাটিয়ে দিল। কোথায় হারিয়ে গেল তার রূপ সৌন্দর্য। জানো তো, তীব্র দুঃখযন্ত্রণায় অনেক মেয়েরই লাবণ্যের ধারা শুকিয়ে যায়। দশ বছর বাদে লোকটি যে কোনো কারণেই হোক তার দৃষ্টিশক্তি খুইয়ে, একদিন অসহায় অবস্থায় শিশুর মতো অন্যের হাত ধরে মেয়েটির কাছে ফিরে এল। ওর আর কিছু করার নেই। ছবি আঁকা জন্মের মতো শেষ। মেয়েটিও খুব খুশি যে আর যাই হোক লোকটি তার মুখের চেহারা দেখতে পাবে না। মনে আছে নিশ্চয়, লোকটি ছিল সৌন্দর্যের পূজারী। কিছু না বুঝে সে নিশ্চিন্ত মনেই মেয়েটিকে আবার আঁকড়ে ধরল। মেয়েটির সৌন্দর্যের কথা একটুও ভোলে নি কিন্তু বারবার সে তার রূপের কথা বলত, অপেক্ষা করত তার আর দেখার কোনো উপায় নেই বলে।

'একদিন শিল্পী তার প্রেমিকাকে বলল, জীবনে তার শেষ সাধ হচ্ছে পাঁচটা ছবি আঁকা। পাঁচটা মহান সৃষ্টি। যদি কোনোরকমে একবার দৃষ্টি ফিরে পেত, এই পাঁচটা ছবি এঁকে নিশ্চিন্ত মনে বলতে পারত, আর আমার কিছু চাই না। এরপর যেভাবেই হোক, মেয়েটি কোত্থেকে এক আশ্চর্য মলম যোগাড় করল। এই মলম চোখে লাগালে দৃষ্টি ফিরে পাবে অন্ধ শিল্পী।

'এবার বুঝতে পারছ, মেয়েটি কী সমস্যায় পড়েছিল? দৃষ্টি পেলে শিল্পী যেমন ছবি পাঁচটা আঁকতে পারবে, তেমনি মেয়েটিকেও ত্যাগ করবে। সৌন্দর্য নিয়ে তার কারবার। এই কুৎসিত মেয়েটিকে সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। পাঁচ দিন নিজের সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত মলমটা সে শিল্পীর চোখে লাগাল।'

লিন্ডে কথা থামিয়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ম্যাক্সের দিকে তাকাল। উজ্জ্বল কালো চোখের তারায় বিন্দুসম প্রতিফলিত হচ্ছে ঘরের মধ্যে ঝোলান আলোগুলো।

'আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তুমিও কি রেক্স স্ট্র্যাণ্ডকে ঠিক এতটাই ভালোবাস?'

'যদি তাই হয়!' ম্যাক্সও বেপরোয়া।

'সত্যিই কি তাই?'

'হ্যাঁ।'

'এতখানি স্বার্থত্যাগ করতে পারবে? ওকে ছাড়তে পারবে?'

অনিচ্ছুক ধীর কণ্ঠে উচ্চারণ করল যেন, 'হ্যাঁ।'

'তুমি কি আমার সঙ্গে ফিরে যাবে?'

'হ্যাঁ।' এবার ম্যাজের কণ্ঠস্বর ফিসফিসানির পর্যায়ে গিয়ে নামল। 'আগে ভালো হয়ে যাক—তারপর।'

'আমি কী বলছি বুঝেছ? সেই জেনেভা লেকের মতো। তুমি আবার আমার স্ত্রী হবে?'

ম্যাজ কুঁকড়ে নুয়ে গেল তবু ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

'বেশ—ওই কথাই রইল।' সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল লিন্ডে, নিজের বোঁচকাটার দিকে এগিয়ে গিয়ে বাঁধন খুলতে শুরু করল। 'আমাকে সাহায্য করা দরকার। ওর ভাইকে ডাক। যে কজন আছে সবাইকেই ডাক। ফুটন্ত জল চাই—প্রচুর পরিমাণে। ব্যান্ডেজ এনেছি, কিন্তু তোমার কাছে কী আছে একবার দেখে নিই—'

ইতিমধ্যে সবাই ঘরে এসে ঢুকেছে। 'এই যে ড'—লিন্ডে নির্দেশ দিল, 'এক্ষুনি একটা আগুন জ্বালিয়ে জল ফোটাতে শুরু কর। আর তুমি—ওই টেবিলটাকে সরিয়ে জানলার সামনে রাখ। পরিষ্কার কর ওটাকে—ঘষে ঘষে ছাল ছাড়িয়ে ফেল একেবারে। যত পার পরিষ্কার কর—আর মিসেস স্ট্র্যাঙ, তুমি আমার পাশে থেকে সাহায্য কর। চাদর নেই নিশ্চই? যাক গে, সে ব্যবস্থা করে নেওয়া যাবে। তুমি তো ওর ভাই? শোনো, আমি ওকে অজ্ঞান করব, কিন্তু তারপর অ্যানাসথেসিয়ার ভারটা তোমাকেই নিতে হবে। এবার যা যা নির্দেশ দিচ্ছি, ভালো করে শুনে নাও। কিন্তু তার আগে হ্যাঁ, ভালো কথা, নাড়ি দেখতে জানো তো?'

দুঃসাহসী এবং পারদর্শী শল্য চিকিৎসক হিসেবে চিরদিনই লিন্ডের খুব খ্যাতি। কিন্তু কী দুঃসাহসিকতায় কী পারদর্শিতায় এবার সে তার নিজের খ্যাতিকেও ম্লান করে দিয়েছে। দিনের পর দিন, সপ্তার পর সপ্তা লড়াই চালিয়ে গেছে। এরকম বীভৎসভাবে ছিন্ন-ভিন্ন, হাড়গোড় ভাঙা একটা রোগী, এইভাবে এতদিন বিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকা একটা মানুষকে নিয়ে ডাক্তার লিন্ডে কখনো কাজ করে নি। তবে সেইসঙ্গে এটাও ঠিক যে সে এ অবধি কোনোদিন এত স্বাস্থ্যবান একজন মৃত্যুপথযাত্রীকে চিকিৎসা করার সুযোগ পায় নি। লোকটার প্রাণ বাঘের মতো, তা না হলে ডাক্তারের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যেত। কী মানসিক, কী শারীরিক, স্বীকার করতেই হবে, যেন অদ্ভুত ওর বোঝার ক্ষমতা।

দিনের পর দিন কেটেছে যখন ও প্রচণ্ড জ্বরে ভুল বকেছে, দিনের পর দিন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেকেছে অতি ক্ষীণ হয়ে, নাড়ি খুঁজে পাওয়ায় দুষ্কর হয়েছে। দিনের পর দিন জ্ঞান ফেরার পরেও মরা মানুষের মতো ক্লান্ত চোখ খুলে পড়ে থেকেছে, তীব্র যন্ত্রণায় সারা মুখ জুড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। লিন্ডেও অক্লান্ত পরিশ্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সুযোগ্য, নিষ্ঠুর, দুঃসাহসী আর ভাগ্যবান লিন্ডে একের পর এক ঝুঁকি নিচ্ছে এবং জয়লাভও করছে। মানুষটাকে শুধু প্রাণে বাঁচিয়েই সন্তুষ্ট নয় সে। ঠিক সেই আগের সুস্থসবল সম্পূর্ণ মানুষটাকে ফিরিয়ে দেবে বলেই একের পর এক অত্যন্ত জটিল আর বিপজ্জনক অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি নিচ্ছে।

'ও কি পঙ্গু হয়ে যাবে।' ম্যাজ জিজ্ঞেস করল একদিন।

'মোটেই না। আগের সেই জোয়ান মানুষটাকে ভেঙচি কাটার মতো ও যে শুধু লেঙচে লেঙচে হাঁটবে, আর কথা কইবে, তাই নয়—ছুটবে, লাফাবে, নদী সাঁতরাবে, ডাম্বুক

ধরবে, তার সঙ্গে লড়াই করবে—সাধ মিটিয়ে আহাম্মুকি করতে পারবে। তাছাড়া আমি এখনই তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, আগের মতোই মেয়েদের কিন্তু ও একইভাবে আকৃষ্ট করবে। সেটা কী তোমার খুব ভালো লাগবে? মনে রেখো কিন্তু, ওকে ছেড়ে তোমাকে চলে আসতে হচ্ছে।'

'বল, বল, বলে যাও।' দ্রুত নিশ্বাস পড়ে ম্যাজের। 'ওকে তুমি পুরো সারিয়ে দাও। যেমনটি ছিল তেমনি।'

একাধিক বার, স্ট্র্যাঙের অবস্থা একটু ভালো বুঝলেই, লিন্ডে ওকে অজ্ঞান করে সাংঘাতিক সব কাণ্ড করছে। ছিন্নভিন্ন আঙুলগুলোকে নতুন করে কাটছে, জুড়ছে, সেলাই করছে। কদিন বাদে বাঁ হাতটায় একটা খুঁত ধরা পড়ল। হাতটা খানিক দূর ঠিকই তুলতে পারছে কিন্তু তার বেশি আর নয়। সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করে লিন্ডে। অনেকরকমভাবে জোড়াতালি দেওয়া হাতটাকে আবার সে কেটেকুটে ফেলে। গোড়ার থেকে নতুন করে শুরু হয় অস্ত্রোপচার—খুঁতটা দূর করতেই হবে। এরপরেও স্ট্র্যাঙ যে প্রাণে বেঁচে গেল সে শুধু তার অসাধারণ জীবনীশক্তি আর স্বাস্থ্যের জন্যে।

'তুমি ওকে খুন করে ফেলবে।' রকির ভাই অভিযোগ করে একদিন। 'আর কাটাকুটি কর না, অমনি থাকতে দাও। হাতটা আস্ত রেখে মরার চেয়ে পঙ্গু হয়ে বাঁচাও ভালো।'

লিন্ডে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। 'বেরিয়ে যাও। এক্ষুনি বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আমায় যা করার করতে দাও, তারপর এসে বলো বেঁচেছে না মরেছে। কেন বুঝতে পারছ না, এখন আমি যা বলব প্রাণ গেলেও তাই তোমাদের করতে হবে। তোমার ভাইয়ের এখন জীবনমরণ সমস্যা—মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে। একটু এদিক ওদিক হলেই—ব্যাস! এবার বুঝতে পারছ? এসব কথা ওর কানে গেলে, একটু দুশ্চিন্তা দেখা দিলেও সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। যাও এখন বাইরে গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে মুখে হাসি নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এস। ঠিক বেঁচে যাবে। দুজনে মিলে ওই আহাম্মুকি করার আগে ঠিক যেমনটি ছিল, আবার তেমনি দেখতে পাবে। যাও যাও, বেরোও বলছি।'

হ্যারি ঘুষি পাকিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ম্যাজের দিকে তাকাল পরামর্শ নিতে।

'প্লিজ—যাও এখন।' অনুরোধ করল ম্যাজ। 'ঠিকই বলেছে ডাক্তার। সত্যি কথাই বলেছে।'

এরপর একদিন স্ট্র্যাঙের অবস্থা একটু ভালোর দিকে গেলে ওর ভাই বলল, 'সত্যি ডাক্তার, তুমি অসাধ্য সাধন করেছ। কিন্তু কী বিশ্রী ব্যাপার বলত, তোমার নামটাই জিজ্ঞেস করা হয় নি।'

'নাম নিয়ে কি ধুয়ে খাবে! নিজের চরকায় তেল দাও গে যাও। যাও যাও, বিরক্ত কর না এখন।'

'ডান হাতটা কিন্তু ঠিকমতো সারছে না। চামড়া ফেটে আবার পুঁজ বেরোচ্ছে, দগদগে হয়ে উঠেছে ঘা-টা।

'নেক্রোসিস।' লিন্ডে মন্তব্য করল।

'ব্যাস—এইবার খতম।' হাহাকার করে উঠল হ্যারি।

'চুপ কর।' ধমক লাগাল লিন্ডে। 'বেরিয়ে যাও। শিগ্‌গির ড' আর বিলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়। জ্যান্ত খরগোশ ধরে আনো দেখি—বেশ মোটাসোটা দেখে আনবে। ফাঁদ পেতে ধরবে। চারদিকে ফাঁদ পেতে দাও।'

'কটা চাই?' হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

'চল্লিশ—চারশো—চার হাজার—যত পার নিয়ে এস। মিসেস্ স্ট্র্যাঙ—আমাকে একটু সাহায্য করা দরকার। হাতটা আরেকবার কেটে ব্যান্ডেজ করব। কই—তোমরা গেলে না এখনো!'

লিন্ডে নিপুণ হাতে ত্বরিতে ছুরি চালাল। হাড়ে পচ ধরেছে। চেঁচে চেঁচে সরিয়ে দিচ্ছে পচা মাংসগুলো। কতদূর পচ লেগেছে দেখে নিচ্ছে লিন্ডে।

'এরকম হবার কথা ছিল না কিন্তু।' ম্যাজকে বলল লিন্ডে। 'আসলে শরীরের বিভিন্ন অঞ্চলে লড়াই চালাতে হচ্ছে বলে ওর প্রাণশক্তি সুযোগ পায় নি ক্ষত নিরাময় করার। আগেই দেখেছিলাম, তবু অপেক্ষা করেছি সেরে যায় কিনা দেখতে। নাহ্—হাড়টাকে বাদ দিতেই হবে। হাড়টা বাদ দিলে ও প্রাণে মরবে না কিন্তু খরগোশের হাড়টা জুড়তে পারলে আগের মতোই আবার সব কিছু করতে পারবে।'

শয়ে শয়ে খরগোশের মধ্যে থেকে দেখে শুনে বাছাই করে বার বার পরীক্ষা করে, একটা পছন্দ করল লিন্ডে। ক্লোরোফর্মের শেষ ফোঁটাও নিঃশেষ করে শেষ পর্যন্ত বোন-গ্র্যাফটিং হল—কাঁচা হাড়ের সঙ্গে কাঁচা হাড়, জীবন্ত মানুষের সঙ্গে জীবন্ত প্রাণী—অনড় অবস্থায় ব্যান্ডেজের বাঁধনে এক হয়ে পড়ে রয়েছে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া একটি নিখুঁত বাহুর জন্ম দিচ্ছে।

অধীর আগ্রহে দিনের পর দিন অপেক্ষা করে আছে সবাই। ফলাফল এখনো জানা যায় নি। এরই মধ্যে বেশ কয়েকবার লিন্ডে আর ম্যাজের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে। লিন্ডে যেমন সদয় নয় তেমনি ম্যাজও বিদ্রোহী নয়।

'কী বিশ্রী ব্যাপার বলত!' লিন্ডে একদিন ম্যাজকে বলল। 'তবু আইন যা আইন। তুমি ডিভোর্স না নেওয়া অবধি আমরা আবার বিয়ে করতে পারব না। তোমার কী ইচ্ছে? জেনেভা লেকে যাবে?'

'তুমি যা বল।'

আরেক দিন লিন্ডে ম্যাজকে বলেছে, 'আচ্ছা, ওই লোকটার মধ্যে তুমি এমন কী দেখেছিলে বলত? জানি, ওর অনেক পয়সা ছিল। কিন্তু আমরাও তো মোটামুটি স্বাচ্ছন্দেই দিন কাটাচ্ছিলাম। তখন তো বছরে প্রায় গড়ে চল্লিশ হাজার করে পেতাম ডাক্তারি করে। রাজপ্রাসাদ আর স্টিম নৌকো বাদ দিলে আর কিছুর অভাব ছিল না তোমার।'

'তোমার কথার মধ্যেই বোধহয় তোমার প্রশ্নের উত্তরও লুকিয়ে আছে। মনে হয় তুমি তোমার ডাক্তারি নিয়ে খুব বেশি ব্যস্ত ছিলে, সময় দিতে পার নি একটুও। আমাকে তুমি ভুলে গিয়েছিল তখন।'

'তাই নাকি।' তির্যকভাবে বলল লিন্ডে। 'কিন্তু তোমার রেক্সও তো দেখছি চিতাবাঘ আর ছোট ছোট কাঠি নিয়ে খোঁচা দেওয়ার খেলায় ঠিক তেমনি ব্যস্ত।'

লিন্ডে ক্রমাগত খুঁচিয়ে চলে ম্যাজকে। রেক্সের প্রতি তার এই প্রবল আকর্ষণের কারণ কী বুঝিয়ে বলতেই হবে।

'এর কোনো ব্যাখ্যা নেই।' বারবার এই একই কথা বলেছে ম্যাজ। শেষ পর্যন্ত একদিন রেগে যায়, 'কেন প্রেমে পড়েছে কেউ বোঝাতে পারে না। আমি তো নয়ই। আমি শুধু বুঝতে পেরেছি যে প্রেমে পড়েছি। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক একটা ব্যাপার, রেহাই পাবার কোনো উপায় নেই। সবাই জানে গরুর লেজটা নিচের দিকে ঝোলে। কেউ যদি প্রশ্ন করে, লেজটা কেন নিচের দিকেই শুধু ঝোলে? উত্তর দেওয়া যাবে না, তবু লেজটা কিন্তু সেই নিচের দিকেই ঝুলে থাকবে।'

'তুমি এত চালাক না!' বিরক্তিতে লিন্ডের চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

'তা এত জায়গা থাকতে ক্লনডাইকে এসে হাজির হয়েছিলে কেন?' একদিন প্রশ্ন করল ম্যাজ।

'টাকার গরম। বৌ নেই যে খরচ করব। একটু বিশ্রাম চাইছিলাম। বোধহয় খাটাখাটনি বেশি হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে কলোরাডোতে গেলাম কিন্তু রেহাই পাই নি—টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম আসছে, এমনকি রোগীরাও সশরীরে এসে হাজির হচ্ছে। সিয়াটেলে গেলাম। সেখানেও একই ব্যাপার। র‍্যানসাম তার বৌকে পাঠিয়ে দিল স্পেশাল ট্রেনে চাপিয়ে। এড়াবার কোনো উপায় রইল না। অপারেশন সার্থক—স্থানীয় সংবাদপত্রে খবর—বাকিটুকু অনুমান করে নাও। গা ঢাকা দিতে পালিয়ে এলাম ক্লনডাইক। টম ড'র সঙ্গে যখন দেখা হল তখন কেবিনে বসে তাস খেলছিলাম।'

এরপর একদিন সকালে স্ট্র্যাঙকে খাটসুদ্ধ ঘরের বাইরে এনে রোদ্দুরে শোয়ানো হল।

'এবার তাহলে ওকে বলি?' লিন্ডেকে জিজ্ঞেস করল ম্যাজ।

'না। এখনো সময় হয় নি।'

আরো কয়েকদিন কাটল। স্ট্র্যাঙ এখন খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসতে পারছে। দুপাশে দুজনের কাঁধে ভর রেখে টলমল করে হাঁটছে।

'এবার তাহলে বলে ফেলি?' আবার জিজ্ঞেস করে ম্যাজ।

'না। আমি কোনো আধ খেঁচড়া কাজ করতে চাই না। চাই না আবার নতুন কোনো উপসর্গ দেখা দিক। এখনো ওর বাঁ হাতে একটু ত্রুটি রয়ে গেছে। ব্যাপারটা সামান্য হলেও আমি ছাড়তে রাজি নেই। ঠিক ঈশ্বর যেমনভাবে ওকে সৃষ্টি করেছিল, আমি আবার নতুন করে তাই করব। কালকেই আমি হাতটার একটা ব্যবস্থা করব। আবার অবশ্য ওকে কদিন বিছানায় শুয়েই কাটাতে হবে। জানি, একটুও ক্লোরোফর্ম নেই কিন্তু আমি নিরুপায়। ওকে দাঁতে দাঁত টিপে সহ্য করতে হবে। পারবে, ঠিক পারবে। হজনখানেক মানুষের সহ্য ক্ষমতা আছে ওর একার।'

গ্রীষ্মকাল এসে পড়ে। দূরে পূর্বদিকে পাহাড়ের চূড়োগুলো বাদ দিলে আর কোথাও এখন তুষারের চিহ্ন নেই। দিনটা ক্রমশ বড় হতে হতে শেষে আর রাত বলে কিছু থাকে না। উত্তর দিকে মাঝরাত বরাবর কয়েক মিনিটের জন্যে শুধু দিগন্তপারে সূর্যদেব মুখ লুকোয়। লিন্ডে এখনো স্ট্র্যাঙকে রেহাই দেয় নি। ওর হাঁটাচলা, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গির ওপর নজর রাখছে। বারবার জামা খুলিয়ে হাজার বার শুধু মাংসপেশিগুলোর কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করছে। ম্যাসেজের তো আর অন্ত নেই। লিন্ডেও স্বীকার করে যে ম্যাসেজ করতে করতে টম ড', বিল আর হ্যারি প্রত্যেকেই এখন হাসপাতালের কর্মীর মতো দক্ষতা অর্জন করেছে। তবু লিন্ডের মন ভরে না। স্ট্র্যাঙকে দিয়ে সে সবরকম পরিশ্রমের কাজ করায়। কোথাও যদি গোপন দুর্বলতা থাকে টের পেয়ে যাবে। লিন্ডে আবার এক সপ্তার জন্যে বিছানায় শুইয়ে ফেলল স্ট্র্যাঙকে। পায়ের ওপর ফের কাটকুটি শুরু করল কয়েকটা ছোট শিরা নতুন করে জুড়বে বলে। কফির দানার মতো ছোট এক টুকরো হাড়কে ঘষে ঘষে সমান করে শেষ পর্যন্ত চামড়া টেনে স্টিচ করে জুড়ে দিল।

'এবার বলতে দাও!' ম্যাজ অনুরোধ করল।

'উঁহুঁ—সময় হলে আমিই তোমায় বলতে বলব।'

জুলাই পার হয়ে গেল, আগস্টও শেষ হব হব করছে, এমনি সময় লিন্ডে একদিন হুকুম করল, আজ স্ট্র্যাঙকে হরিণ শিকারে বেরোতে হবে। লিন্ডে স্ট্র্যাঙের পিছু নিল।

সজাগ নজর রাখছে। ছিপছিপে গড়ন স্ট্র্যাঙের, মাংসপেশিতে বাঘের শক্তি। লিন্ডে কখনো এমন ভাবে কোনো মানুষকে হাঁটতে দেখে নি। এত অনায়াস তার ভঙ্গি, দেহের প্রতিটি অঙ্গ যেন মদত যোগাচ্ছে, কাঁধের মাংসপেশি পর্যন্ত যেন সহযোগিতা করছে। প্রয়াসের কোনো বালাই নেই তাই তার লঘু পায়ের গতি এত অপূর্ব। বড় ছলনাময় ওর হাঁটার গতি। দেখে একটুও বোঝা যায় না যে ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে যাওয়া মূর্খতা। টম ড'ও এই অভিযোগ করেছিল। ঘেমে নেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে লিন্ডে ওর পিছনে পিছনে চলেছে। সমতলভূমি পেলেই খানিকটা করে ছুটে গিয়ে ওর নাগাল পেতে হচ্ছে। দশ মাইল পার হতেই লিন্ডে ওকে থামতে বলে। সটান ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে।

'ব্যস্ ব্যস—আর নয়। তোমার সঙ্গে ছোটার সাধ্য নেই আমার।' মুখ মোছে লিন্ডে। গরমে ঘেমে লাল হয়ে গেছে। স্ট্র্যাঙ একটা গাছের গুঁড়ির ওপর চড়ে বসে। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে হাসে আর প্রকৃতিপ্রেমীর মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারধারের শোভা উপভোগ করে।

'কোথাও কোনো খেঁচকা, ব্যথা, জ্বালা বা জ্বালার ভাব টের পাচ্ছ কি?' লিন্ডে জানতে চাইল।

স্ট্র্যাঙ কোঁকড়া চুলভর্তি মাথাটা নেড়ে, পা ছড়িয়ে, শরীরটা টান করে বসল। ওর দেহের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে প্রাণপ্রাচুর্য আর খুশির গান বেজে ওঠে।

'তোমার আর ভাবনা নেই, প্রথম দুএকটা বছর শীতকালে হয়তো পুরনো ক্ষতগুলোয় একটু ব্যথা হবে, কিন্তু সেটা থাকবে না। এমনও হতে পারে যে কোনো ব্যথাই তুমি টের পাবে না।'

'সত্যি ডাক্তার, অসাধ্য সাধন করেছ তুমি। কী করে যে ধন্যবাদ দেব জানি না। তোমার নামটা অবধি জানা হয় নি।'

'নামে কী যায় আসে। তোমাকে যে সারিয়ে তুলেছি সেটাই বড় কথা।'

'কিন্তু তোমার যে বেশ নাম-ডাক আছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। হয়ত তোমা নামটাও আমার পরিচিত।'

'হবে হয়ত।' লিন্ডে কথাটা এড়িয়ে গেল। 'কাজের কথায় আসা যাক। এবার তোমার শেষ পরীক্ষা। এটাতে যদি সফল হও, ব্যাস্—আমার কাজ শেষ। শুনেছি এই খাঁড়ির মাথার দিক দিয়ে বিগ ওয়াইল্ড নদীর একটি শাখা নদী বয়ে যাচ্ছে। ড'র মুখে শুনেছি, গত বছর তুমি এই নদীটার মাঝের ফালি অবধি গিয়ে ফিরে এসেছিলে। মাত্র তিন দিনে। ড' বলছিল তুমি নাকি ওর প্রাণ বার করে ছেড়ে দিয়েছিলে। আজকের রাতটা তুমি এখানেই থাকবে। ছাউনি ফেলার সাজসরঞ্জাম সমেত আমি এখুনি ড'কে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আগের বছরের মতো তিন দিনের মধ্যে তোমাকে ওই অবধি গিয়ে ফিরে আসতে হবে। তবে বুঝব একেবারে শরীর সেরেছে।'

'এক ঘণ্টার মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে হবে।' লিন্ডে হুকুম করল ম্যাজকে। 'আমি যাচ্ছি নৌকোর ব্যবস্থা করতে। বিল হরিণ মারতে গেছে কাজেই তিন দিনের আগে ফিরছে না। আজই আমরা আমার কেবিনে পৌঁছে যাব। সপ্তাখানেক লাগবে ডসন্ পৌঁছতে।'

'আমি আশা করেছিলাম...' কথাটা শেষ করল না ম্যাজ।

'আশা করেছিলে আমি পারিশ্রমিকটা চাইব, না?'

'চুক্তি যা চুক্তি—মানতেই হবে। তবে এরকম বিশ্রীভাবে ব্যাপারটা না ঘটালেও চলত। তুমি কিন্তু অন্যায় করলে। তিন দিনের জন্যে ওকে এমন এক জায়গায় পাঠিয়ে দিলে যে

শেষ কটা কথা বলারও সুযোগ দিে

'চিঠি লিখে রেখে যাও।'

'কোনো কথাই লিখতে আমি বাদ দেব না।'

'হ্যাঁ তাই লিখো, না হলে সেটা আমাদের তিনজনের প্রতিই অন্যায় করা হবে।'

নৌকার ব্যবস্থা করে ফিরে এসে লিন্ডে দেখল, ম্যাজ জিনিসপত্র বেঁধে ফেলেছে, চিঠি লেখার কাজও শেষ।

'চিঠিটা একবার পড়তে পারি? যদি তুমি চাও, তবেই অবশ্য।'

ক্ষণিকের জন্যে ইতস্তত করে ম্যাজ চিঠিটা বাড়িয়ে দিল।

'একেবারে সোজাসুজি লিখেছ।' চিঠিটা শেষ করে মন্তব্য করল লিন্ডে। 'এবার চল তাহলে।'

ম্যাজের বোঁচকাটা নদীর তীর অবধি বয়ে নিয়ে এল লিন্ডে। হাঁটু গেড়ে বসে এক হাত দিয়ে নৌকোটাকে স্থির করে, অন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল ম্যাজের দিকে। নৌকোয় উঠতে সুবিধে হবে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ম্যাজের মুখের দিকে তাকাল লিন্ডে। আশ্চর্য—অস্থিরতার কোনো লক্ষ্মণ নেই। একটুও ভেঙে পড়ে নি ম্যাজ। লিন্ডের হাত ধরে নৌকোয় পা দেবে বলে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

'দাঁড়াও।' লিন্ডে বলল। 'এক সেকেন্ড দাঁড়াও। সেই যে তোমাকে যাদু মলমের গল্পটা বলেছিলাম মনে আছে তো? গল্পের শেষটা বলা হয় নি। শিল্পীর চোখে ওষুধ লাগিয়ে মেয়েটি বিদায় নিতে যাবে, সহসা তার আয়নায় চোখ পড়ে গেল। কী আশ্চর্য—সে তার আগের রূপ ফিরে পেয়েছে। শিল্পী চোখ মেলেই তার সুন্দরী প্রেয়সীকে দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরল।'

অধীর উত্তেজনা কোনোক্রমে প্রশমিত করে নীরবে অপেক্ষা করে ম্যাজ। লিন্ডের মুখের শেষ কথাটা জানবার জন্যে অধীর আগ্রহ অনুভব করছে। তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে বিস্ময়ের প্রথম আভাস।

'সত্যিই তুমি সুন্দরী ম্যাজ।' একটু থেমে লিন্ডে এবার শুষ্ক কণ্ঠে যোগ করল, 'বাকিটুকু আর বলার প্রয়োজন আছে কি? রেক্স স্ট্যাডকে আর বেশিদিন বিরহজ্বালা সহ্য করতে হবে না। গুড বাই—'

'গ্র্যান্ট...' অস্ফুট কণ্ঠে ডাকল ম্যাজ। ডাকের মধ্যেই তার অন্তরের সব কথা লুকিয়ে আছে, কথা বলে বোঝাবার কোনো প্রয়োজন নেই।

কুৎসিতভাবে হাসে লিন্ডে। 'আমি তোমাকে দেখাতে চেয়েছিলাম যে লোকটা আমি ততটা খারাপ নই। শুধু আগুন—জ্বলন্ত আগুন।'

'গ্র্যান্ট—'

নৌকোয় পা দিয়ে লিন্ডে তার লম্বা হাতটা বাড়িয়ে দিল। উত্তেজনায় কাঁপছে হাতটা।

'গুড বাই—'

ম্যাজ তার দুহাতে জড়িয়ে ধল লিন্ডের হাতটা।

'গ্র্যান্ট—আমার গ্র্যান্ট—' ম্যাজের কণ্ঠে গুঞ্জন ওঠে। মুখ নিচু করে হাতের ওপর চুমু খায়।

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে পাড়ের ওপর ঠেলা মেরে নৌকো ছেড়ে দিল লিন্ডে। জলের মধ্যে দাঁড় নামিয়ে নৌকা বাইতে শুরু করে দিল। সামনেই দেখা যাচ্ছে নদীর শান্ত জলস্রোত একটা বাধার সম্মুখীন হয়ে প্রবল উচ্ছ্বাসে সাদা ফেনার মেঘ উড়িয়েছে।

এক টুকরো মাংস

পাউরুটির শেষ টুকরোটা দিয়ে প্লেট থেকে ময়দার তরকারির অবশিষ্টটুকু চেঁচেপুঁছে তুলে নিল টম কিং। টুকরোটাকে মুখে পুরে ধীরে সুস্থে চিন্তামগ্নভাবে চেবাতে শুরু করল। খাওয়া শেষ করে টেবিল থেকে ওঠার পরেও মনে হচ্ছে খিদেটা মেটে নি। তবু তো বাড়ির মধ্যে ও একাই আজ খেয়েছে। ছেলে দুটোকে আগেভাগে ঘুম পাড়িয়ে পাশের ঘরে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে ওরা খেতে পায় নি বলে চেঁচামেচি না করে। টমের বউ মুখে কিছু ঠেকায় নি। চেয়ারে বসে মায়াভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। শ্রমিক ঘরের মেয়ে টমের বৌ। শুকনো রোগা চেহারা হলেও মুখ থেকে লাবণ্যটুকু এখনো পুরো মুছে যায় নি। তরকারির জন্যে ময়দাটা সে প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার করে এনেছিল। শেষ পুঁজি দুটো আধ পেনি খরচ হয়েছে পাউরুটি কিনতে।

জানালার পাশে রাখা একটা অতি রুগ্ন চেয়ারের ওপর বসামাত্র চেয়ারটা টমের ভারের প্রতিবাদে ককিয়ে উঠল। মেশিনের মতো অভ্যাসবশত পাইপটা মুখে গুঁজে কোটের পাশ পকেটে হাত পুরে দিল টম। পকেটে তামাক না পেয়ে তার হুঁশ ফিরল। নিজের ভুলো মনের কথা ভেবে ভুরু কুঁচকে পাইপটা মুখ থেকে সরিয়ে নিল। ওর নড়াচড়ার ব্যাপারটাই কেমন মন্থর । যেন নিজের পেশির ভারে নিজেই কাবু। পাথরের চাঁইয়ের মতো বিশাল দেহের অধিকারী টম কিং। সস্তা কাপড়ের ঢিলেঢোলা প্যান্ট শার্টগুলো বহুদিনের পুরোনো। জুতোর তলায় অনেক দিন আগেই সুকতলা মারা হয়েছে, ওপরের চামড়াও ছিড়ব ছিড়ব করছে। দু শিলিং দামের সূতির শার্টের কালারটা ফাটা। সারা জামায় রঙের দাগ। কাচলেও উঠবে না।

কিন্তু এ সবই গৌণ। টম কিং-এর সত্যিকার পরিচয় পেতে হলে ওর মুখের দিকে তাকাতে হবে। তাহলেই নিঃসন্দেহে বলা যাবে ও একজন পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা। চারচৌকো দড়ি বাঁধা রিঙের মধ্যে জীবনের বেশ কিছু বছর সে পার করেছে আর তারই দৌলতে তার মুখখানা আজ যোদ্ধা পশুর মতোই চিহ্নিত। সত্যি, মুখখানা দেখলেই মেজাজ বিগড়ে যাবার কথা। তার ওপর আবার পরিষ্কার করে দাড়ি কামানোর জন্যে মুখের প্রতিটি রেখা যেন আরো কুৎসিতভাবে আত্মপ্রচার করছে। মুখের মধ্যে একটা গভীর ক্ষতচিহ্নের মতো কদাকার ঠোঁট দুটো থেকে যেন মাত্রাতিরিক্ত রুক্ষতা ঝরে পড়ছে। ভারী ভারী চোয়াল দুটোয় পাশবিক একটা আক্রোশ জমে আছে। লোমশ ভুরুর তলায় অলস মন্থর ভাবাবেগহীন দুটো চোখ। নিছক পশু হিসেবে শনাক্ত করার পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক ওর অনুভূতিশূন্য চোখ দুটো। নিদ্রাতুর চোখ দুটো যেন সিংহের মতো—শিকারি জন্তুর যেমন হয়। কপালের দিকটা ঢালু হয়ে উঠে গেছে। কদমছাঁট চুলের তলায় এবড়ো খেবড়ো মাথাটা পাকা বদমাইশের মতো দেখায়। নাকটা দুবার ভেঙেছে আর অসংখ্য আঘাতে যথেচ্ছ একটা আকার নিয়েছে। কান দুটো আকারে দ্বিগুণ হয়ে ঠিক ফুলকপির মতো ফুলে আছে। এত অলঙ্কারের পর আবার সদ্যকামানো মুখে দাড়ির আভাস একটা নীলচে কালো ছোপ ফেলেছে।

মোটের ওপর অন্ধকার গলিতে বা নির্জন জায়গায় হঠাৎ ওর মুখোমুখি হলে যে কেউ ভয় পেতে পারে। কিন্তু তবু টম কিং অপরাধী নয়। আজ অবধি কোনো অপরাধই সে

করে নি। দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত মামুলি ঝগড়াঝাঁটির কথা বাদ দিলে কারোর কোনো অনিষ্ট করে নি। গায়ে পড়ে ঝগড়া করা অবধি তার স্বভাবে নেই। ও পেশাদার বক্সার। কাজেই ওর চরিত্রের পাশবিক অংশটুকু পেশাদার লড়াইয়ের মঞ্চের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রিঙের বাইরে টম কিং সাদাসিধে মানুষ, কারোর সাতেপাঁচে নেই। অল্প বয়সে যখন প্রচুর রোজগার করেছে, নিজের ভালোমন্দ বিচার না করেই পাঁচ জনের জন্যে অঢেল করেছে। কারোর ওপর ওর যেমন কোনো বিদ্বেষ নেই, তেমনি ওর কোনো শত্রু নেই বললেই চলে। লড়াইটা ওর কাছে একটা ব্যবসা। রিঙের মধ্যে ও আঘাত হানে যখন, ধ্বংস করবার জন্যেই হানে। বাকরুদ্ধ করবার জন্যেই হানে। কিন্তু তার মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কাজ করে না। এটা সাদাসিধে লেনদেনের ব্যাপার। লোকে যে পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে খেলা দেখতে হাজির হয় সে তো একজন আরেকজনকে গায়ের জোরে হারিয়ে দিচ্ছে দেখবার জন্যেই। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে টম লড়তে নেমেছিল উলুজুলু গজারের বিরুদ্ধে। তার মাত্র চার মাস আগে নিউ ক্যাসেলের লড়াইয়ে গজারের চোয়াল ভেঙেছিল। সব জেনেশুনেই টম ওর ভাঙা চোয়ালটাকেই তার আক্রমণের লক্ষ্য করে নবম রাউন্ডে আবার গজারের চোয়াল ভেঙেছিল। তার মানে কিন্তু এই নয় যে গজারের ওপর তার বিশেষ কোনো রাগ ছিল। লড়াইয়ে জেতবার এইটাই ছিল সহজ উপায়। না জিতলে টাকা আসবে কোত্থেকে। গজারও এর জন্যে টমের ওপর আদৌ বিরূপ হয় নি। এইটাই তো খেলা আর খেলতে যখন ওরা নামে তখন নিয়ম জেনেই নামে।

টম কিং কোনোদিনই বেশি কথার মানুষ নয়। জানলার ধারে বসে বিষণ্ন দৃষ্টিতে নীরবে তাকিয়ে ছিল হাত দুটোর দিকে। হাতের উলটো পিঠে শিরাগুলো দড়ির মতো ফুলে আছে। আঙুলের গাঁটগুলো বারবার চোট খেয়ে থেঁতলে যে বিশ্রী আকার ধারণ করেছে তার থেকেই বোঝা যায় এগুলোকে কোন কাজে লাগানো হয়েছে। শিরা উপশিরার সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের কথা টম কিং জানে না কিন্তু কেন ওগুলো অমন ফুলে উঠেছে সেটা জানে। ওর হৃৎপিণ্ড বারংবার উচ্চ চাপে এবং অত্যধিক মাত্রায় রক্ত সরবরাহ করেছে শিরাগুলোয়। দীর্ঘদিন এই ঘটনা ঘটতে থাকায় শিরাগুলো এখন আর কোনো সময়েই সাধারণ অবস্থায় ফিরে আসে না। শিরার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে টমের সহ্য ক্ষমতাও হ্রাস পেয়েছে। এখন ও অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এখন ও আর আগের মতো কুড়ি রাউন্ডের লড়াই চালাতে পারে না। এক রাউন্ডের পর আর এক রাউন্ড ঢঙ ঢঙ ঘণ্টাধ্বনি, ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড লড়াই, লড়াই আর লড়াই, মারের বদলা মার, দড়ির ওপর আছড়ে পড়া ও প্রতিপক্ষকে আছড়ে ফেলা, আর ওস্তাদের শেষ মার দিতে শেষ রাউন্ডে দর্শকদের কানফাটা চিৎকারের মধ্যে বারবার ছুটে যাওয়া, বারবার ঘুষির বন্যা বওয়ানো, বারবার মাথা নুইয়ে আঘাত বাঁচানো। কিন্তু এর জন্য তখন তার বিশ্বস্ত হৃৎপিণ্ড সবল ধমনি দিয়ে প্রতি মুহূর্তে তাজা রক্তের বন্যা বওয়াত। সেই মুহূর্তে স্ফীত হয়ে উঠত প্রতিটি ধমনি। আবার প্রয়োজন ফুরোলে আগের আকার ধারণ করত। পুরোপুরি আগের আকার ফিরে পেত বলা ভুল, কারণ যত সামান্যই হোক, দৃষ্টিতে ধরা না পড়ুক, শিরাগুলো কিন্তু প্রতিবারই একটু একটু করে আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। শির ফোলা থেঁতলানো হাতের দিকে চেয়ে টমের মনে পড়ে যায় তার তরুণ বয়সের সাফল্যের কথা। ওয়েলশের আতঙ্ক নামে পরিচিত বেনি জোনসের মাথায় ঘুষি চালিয়ে সেই প্রথম ওর আঙুলের গাঁট থেঁতলে গিয়েছিল।

খিদেটা আবার মাথা চাগাড় দেয়।

'ব্লিমি, এক টুকরো মাংসের ব্যবস্থা করা যায় না?' হাতের বিরাট মুঠোটা পাকিয়ে বিড়বিড় করে উঠল টম। তারপর চাপা গলায় একটা অশালীন মন্তব্য করল।

'বার্ক আর সলির ওখানে দুজায়গাতেই চেষ্টা করেছি।' প্রায় ক্ষমাপ্রার্থীর মতো বলল ব্লিমি।

'দিল না?'

'আধ পেনিও না। বার্ক বলল—' ব্লিমির কথা আটকে যায়।

'থামলে কেন, বল কী বলেছে?' প্রায় হুমকি দেয় টম।

'বলছিল স্যান্ডেলের সঙ্গে আজ রাত্তিরে তোমার লড়াইয়ের কথা জানে কিন্তু ...তাছাড়া ইতিমধ্যেই অনেক বাকি পড়ে গেছে।'

টমের মুখ থেকে একটা বিরক্তিসূচক ধ্বনি ছাড়া আর কোনো কথা শোনা যায় না। মনে পড়ে যায়, পোষা বুলটেরিয়ার কুকুরটাকে একদিন ও বেহিসাবে মাংস খাইয়েছে। বার্কও তখন ধার দিতে বিন্দুমাত্র গররাজি হত না। কিন্তু সময় বদলে গেছে। টম কিং-এর এখন বয়স হয়েছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্লাব আয়োজিত মুষ্টিযুদ্ধের আসরে নেমে কোনো প্রৌঢ় মুষ্টিযোদ্ধা কখনো দোকানির কাছ থেকে বেশি ধার আশা করতে পারে না।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে ওঠা অবধি একটু মাংস খাবার জন্যে মনটা উতলা হয়ে রয়েছে। আজকের লড়াইয়ের জন্যে উপযুক্ত ট্রেনিঙের সুযোগ পায় নি টম। অনাবৃষ্টির দরুন এ বছর অস্ট্রেলিয়ার যে কোনো ধরনের একটা সাময়িক কাজ জোগাড় করাও শক্ত হয়ে পড়েছে। প্র্যাকটিস করার মতো সহকারী অবধি নেই টমের। ভালো খাবার তো দূরের কথা, সব সময় পেট ভরা খাবারও জোটে নি। যখন যেমন সুযোগ পেয়েছে দুএকদিন করে মাটি কাটার কাজ করেছে আর প্রতিদিন ভোরবেলা নিয়ম করে দৌড়েছে যাতে পায়ের জোর না হারায়। তবু দুটো নাবালক সন্তান আর স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করার পর একা একা সঙ্গী ছাড়া প্র্যাকটিস করা এক দুরূহ কাজ। স্যান্ডেলের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা ঘোষণা হবার পরেও দোকানিদের কাছে কোনো বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায় নি। শুধু 'গেইটি' ক্লাবের সেক্রেটারি তাকে তিন পাউন্ড দিয়েছিলেন। লড়াইয়ে হারলেও এই তিন পাউন্ড তার পাবার কথা। সেই জন্যেই তিন পাউন্ডের বেশি ধার হিসেবে দিতে সেক্রেটারি রাজি হন নি। পুরোনো বন্ধুদের কাছ থেকে মাঝেসাঝে দুচার শিলিঙ চেয়ে চিন্তে এনেছে, এ বছর খরা না হলে তারা নিশ্চয় আরো বেশি দিতে পারতো। স্বীকার না করে উপায় নেই যে সত্যিই ওর ঠিকমতো ট্রেনিঙ হয় নি। আরো ভালো খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজন ছিল, সব দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া উচিত ছিল। তাছাড়া চল্লিশ বছর বয়সে একজনকে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হতে হলে যে কষ্ট পোয়াতে হয়, বিশ বছরের তরুণকে নিশ্চয় তা হয় না।

'কটা বাজল লিজি?' টম জিজ্ঞেস করল।

লিজি উঠে গিয়ে পাশের বাড়ি থেকে সময় জেনে এল। 'আটটা বাজতে পনের।'

'আর দুচার মিনিটের মধ্যেই প্রথম খেলাটা শুরু হবে। তবে ওটা শুধু যাচাই করে দেখার জন্যে। এরপর হবে ডিলার ওয়েলশ আর গ্রিডলি'র চার রাউন্ডের খেলা। তারপর স্টারলাইট আর একটা নাবিকের মধ্যে দশ রাউন্ড। কাজেই ঘন্টাখানেকের আগে আমার ডাক পড়বে না।'

আরো মিনিট দশেক মুখ বুজিয়ে কাটিয়ে দিয়ে টম উঠে দাঁড়াল।

'আসলে কী জানো লিজি, আমি একেবারেই প্র্যাকটিসের সুযোগ পাই নি।'

টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ায় টম। লিজিকে চুমু খাবার কোনো ইচ্ছে প্রকাশ পায় না। এটা টমের চিরকালের স্বভাব। বেরোবার মুখে কোনোদিন চুমু খায় না। আজ লিজি কিন্তু দুহাতে টমের গলা জড়িয়ে ধরে প্রায় জোর করে ওর মাথা নুইয়ে চুমু খেল। বিশাল চেহারার টমের পাশে লিজিকে যেন পুতুলের মতো দেখায়।

'গুড লাক টম। জিততে হবেই কিন্তু—' লিজি বলল।

'হ্যাঁ, জিততে হবেই।' ফের একই কথা বলে টম। 'এটাই এখন কাজ—জেতা—জিততে হবেই।'

টম হেসে ওঠে। খুশি হবার ভাব দেখাতে চায়। লিজি ওকে আরো জড়িয়ে ধরে। লিজির কাঁধের ওপর দিয়ে তাকায় টম। আসবাবহীন ফাঁকা একটা ঘর। টমের নিজের বলতে আছে এই ঘরখানা, লিজি আর তার দুই সন্তান। তাও বাড়িভাড়া বাকি পড়ে আছে। সঙ্গিনী আর ছানাদের খাদ্য সংস্থানের জন্যে এই আস্তানা ছেড়ে নিশুতি রাতে অভিযানে বেরোতে হচ্ছে টমকে। বর্তমান যুগের কলকারখানার মজুররাও যন্ত্রের মধ্যে নিজেদের পেষাই করে খাদ্য সংস্থানের জন্যে। কিন্তু টমের পদ্ধতিটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেই প্রাচীন আদিম রাজকীয় ভঙ্গিতে বন্য পশুর মতো লড়াই করে সংগ্রহ করছে ও খাদ্য।

'হারাতেই হবে—হারাতেই হবে।—' টম মরিয়া হয়ে উঠেছে বোঝা যায়। 'জিততে পারলেই তিরিশ ডলার। সব ধার শোধ হয়েও কিছু থেকে যাবে। হারলে একটি কানাকড়ি পাব না। ট্রামে চড়ার পয়সা অবধি না। হেঁটে ফিরতে হবে। চলি তা হলে—জিততে যদি পারি সোজা ফিরে আসব বাড়িতে।'

'আমি জেগে থাকব—' টমের পেছন থেকে গলা চড়িয়ে বলল লিজি। পুরো দুমাইল হেঁটে গেইটিতে পৌছতে হবে। টমের মনে পড়ে যায়, একদিন সে নিউ সাউথ ওয়েলশের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিল। তখন ট্যাক্সি ছাড়া লড়াইয়ের আসরে যাবার কথা ভাবাই যেত না। তাছাড়া টম জিতবে বলে যারা জব্বর বাজি ধরত তাদের মধ্যে কেউ না কেউ সঙ্গেই থাকত। টমি বার্নস ছিল—ইয়াঙ্কি জ্যাক জনসন ছিল—ওরা নিজেদের গাড়ি নিয়ে আসত। টম হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলে। সবাই জানে বক্সিঙের আগে দুমাইল পথ হাঁটা কোনো কাজের কথা নয়। টমের বয়স হয়ে গেছে আর বয়স্ক লোকদের ওপর পৃথিবী বড়ই বিরূপ। এখন মাটি কাটার কাজ ছাড়া ওর আর কিছুই মানায় না, কিন্তু সেখানেও ওর এই ভাঙা নাক আর স্ফীতকায় কান দুটো প্রতিবন্ধক। টম ভাবে কী কুক্ষণেই না সে কোনো হাতের কাজ শেখে নি। শিখত যদি শেষ পর্যন্ত কাজেই লাগত। কিন্তু সে কথা কেউ তাকে বলে নি। অবশ্য বললেও সে উপদেশ কানে নিত না টম। তখন জীবনের পুরো ছবিটাই ছিল রঙিন। সহজলভ্য অর্থ—তীব্র গৌরবময় লড়াই—দুই লড়াইয়ের মাঝে অফুরন্ত অবসর—উন্মাদ সমর্থকদের ভিড়—পিঠ চাপড়ানি—করমর্দন—পাঁচ মিনিট কথা বলার জন্যে ড্রিঙ্কের আমন্ত্রণ—লড়াইয়ের আসরের হর্ষধ্বনি—লড়াইয়ের অন্তিমে ঝড়ের মতো আঘাতহানা আর রেফারির ঘোষণা—'কিং-এর জিত!' পরের দিন সকালে খবরের কাগজের খেলার পাতায় নাম!

সে সব দিনের কথাই ছিল আলাদা! এখন কিন্তু টম ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছে যে সে শুধু পুরোনোদেরই সেদিন বাতিল করে দিয়েছে। উঠতি যৌবন হিসেবে প্রবীণদের তলায় টেনে নামিয়ে দিয়েছে। কাজেই অবাক হবার কিছু নেই যে কাজ হাসিল করতে তাকে কোনো বেগ পেতে হয় নি। তাদের সকলেরই ছিল স্ফীতকায় হাতের শিরা, শ্বেতলানো

আঙুলের গাঁট আর আঘাতে আঘাতে জর্জরিত দেহ—বৃদ্ধ যোদ্ধা। রাশে কাটারস্ বের লড়াইয়ে অষ্টাদশ রাউন্ডে প্রবীণ স্টাউশার বিলকে হারাবার কথা মনে পড়ে যায় টমের। লড়াইয়ের পর ড্রেসিংরুমে বসে শিশুর মতো কান্নায় ভেঙে পড়েছিল বিল। হয়তো বিলেরও বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছিল। হয়ত বাড়িতে ছিল বৌ আর ছেলেমেয়ে। হয়তো সেদিন লড়াইয়ের আগে বিলও এক টুকরো মাংস খাবার জন্যে আকুল হয়েছিল। আজ টম বুঝতে পারছে যে কুড়ি বছর আগে সেই দিনটিতে বিল তার চেয়ে অনেক বেশি ঝুঁকি মাথায় নিয়ে লড়াইয়ের আসরে নেমেছিল। টমের মতো সে শুধু খ্যাতি আর সহজলভ্য অর্থ কুড়াতে আসে নি। তাই হেরে যাবার পর বিলের কান্নাটাও খুব স্বাভাবিক।

একটা মানুষের লড়াইয়ের ক্ষমতা সীমিত। এর কোনো ব্যতিক্রম হবার উপায় নাই। কেউ একশোটা লড়াইয়ের পর ফুরিয়ে যায়। আবার কেউ মাত্র কুড়িটার পরই শেষ। সবটাই নির্ভর করে মানুষটার দৈহিক গঠনের ওপর, তার পেশির তন্ত্রীগুলোর উৎকর্ষের ওপর। নির্ধারিত সংখ্যক লড়াইয়ের পর তাই কারোর পক্ষেই আর কিছু করা সম্ভব নয়। বড় কঠোর এই প্রাকৃতিক বিধান। আর পাঁচ জনের চেয়ে টমের ক্ষমতা বেশিই ছিল বলতে হবে। সেই ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে লড়াইয়ের পর লড়াইয়ে। জান-প্রাণ উজার করে লড়াই—হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস ফাটিয়ে—ধমনিকে স্ফীত করে। এজন্যেই যৌবনের নমনীয় মাংসপেশিগুলো দড়ির মতো গাঁট পাকিয়ে গেছে। দেখা দিয়েছে স্নায়বিক দুর্বলতা। সহ্যশক্তি কমে এসেছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ঝিমিয়ে পড়েছে দেহ মন। হ্যাঁ, আর পাঁচজনের তুলনায় টম অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেছে। তার পুরোনো মুষ্টিযোদ্ধা বন্ধুদের কেউই আর টিকে নেই। এক এক করে সবাই বিদায় নিয়েছে আর তাদের সেই বিদায়ের আয়োজনে টমও অনেক সময় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

প্রবীণদের বিরুদ্ধে তাকে লড়াইয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল আর টমও এক এক করে সবাইকে অপসারিত করে গেছে। স্টাউশার বিলের মতো কেউ যখন ড্রেসিংরুমে বসে কান্নায় ভেঙে পড়েছে ও তখন হেসেছে। এখন টম নিজে প্রবীণদের দলভুক্ত। তার বিরুদ্ধে তাই লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে নবীনদের। আজকের এই স্যান্ডেল ছোকরাটা এসেছে নিউজিল্যান্ড থেকে। সেখানে নাকি নামও কিনেছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় কেউ তার সম্বন্ধে কিচ্ছু জানে না বলেই টমের সঙ্গে এই বক্সিঙের আয়োজন। স্যান্ডেল যদি আজ তাগদ দেখাতে পারে তাহলে আরো নামকরা যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়ার, আরো বেশি অর্থ উপার্জন করার সুযোগ পাবে। কাজেই স্যান্ডেল আজ জেতবার জন্যে চেষ্টার কসুর করবে না। অর্থ, খ্যাতি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হাতছানি দিচ্ছে স্যান্ডেলকে। সৌভাগ্য আর স্যান্ডেলের মাঝে বাধা বলতে এখন শুধু আছে পুরোনো ঘাঘু টম কিং। যে টমের পাওনা খুব বেশি হলে তিরিশটা মাত্র ডলার। বাড়িঅলা আর দোকানির ধার শোধ করতেই যা খরচ হয়ে যাবে। ভাবতে ভাবতেই এক সময় টমের চোখের সামনে তারুণ্য যেন রক্ত মাংসের রূপ ধারণ করে। তারুণ্য—মহান তারুণ্য—অজেয় আর উৎফুল্ল—উজ্জীবিত পেশি ও স্নায়ের রেশম কোমল চামড়া—অক্লান্ত অবিদীর্ণ হৃৎপিন্ড আর ফুসফুস। যে তারুণ্য শক্তি ও সামর্থ্যের অভাব দেখলেই ফেটে পড়ে হাসিতে। তারুণ্যই বিধ্বংসের দেবতা। পুরোনোকে সে ধ্বংস করে আর তার সঙ্গে নিজেকেও তিল তিল করে খুইয়ে ফেলে। ক্রমশ তারও ধমনি আকারে বৃদ্ধি পায়, আঙুলের গাঁটগুলো যায় থেঁতলে আর একদিন সেও পড়ে যায় পুরোনো বাতিলদের দলে। কারণ তরুণ যা তা চির তরুণই থাকে, শুধু যুগটাই যা পাল্টে যায়।

ক্যাসেলরিগ স্ট্রিটে পা দিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিল টম। তিনটি বাড়ির পরেই গেইটি। এক

লম্বা ছোকরা প্রবেশ পথের মুখেই ভিড় জমিয়ে ছিল। ওকে দেখে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। টম শুনতে পেল ওরা বলাবলি করছে, টম কিং! এই তো টম কিং!

ড্রেসিংরুমে ঢোকবার আগেই ক্লাবের সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা। যুবকটির চোখে মুখে ধূর্ততার ছাপ। করমর্দন করে বলল, 'কেমন লাগছে বলুন?'

'চমৎকার! পুরোপুরি ফিট।' টম জেনেশুনে ডাহা মিথ্যে কথাটা বলল। পয়সা থাকলে এখুনি ও একটু মাংস খাবার ব্যবস্থা করত।

ড্রেসিংরুম ছেড়ে বারান্দা পেরিয়ে হলঘরের মাঝে চৌকো রিঙের কাছে এসে দাঁড়াতেই অপেক্ষারত জনতা হর্ষধ্বনি করে অভিবাদন জানাল। একবার ডান দিকে আর একবার বাঁ দিকে ফিরে টমও অভিবাদনে সাড়া দিল। বলতে গেলে সবই অচেনা মুখ। বেশির ভাগই কিশোর। টম যখন প্রথম নাম করেছে তখন এদের অনেকেই বোধ হয় জন্মায়ও নি। উঁচু মঞ্চটার ওপর এক লাফে উঠে এল টম। ঘাড় নুইয়ে দড়ির তলা দিয়ে ঢুকে এক কোণে নিজের জায়গায় চলে এল। ফোল্ডিং টুলের ওপর বসল। রেফারি জ্যাক বল এগিয়ে এসে করমর্দন করল। বলও এককালের পেশাদার বক্সার। অবশ্য দশ বছর আগেই সে লড়াই ছেড়ে দিয়েছে। বলকে রেফারি দেখে কিং খুশি হয়। পুরোনো দিনের লোক বল, স্যান্ডেলকে একটু বেআইনিভাবে মারধোর করলেও বল্ সেদিকে নজর দেবে না।

এক এক করে ভারী হেভিওয়েট বক্সাররা রিঙে উঠছে আর রেফারি তাদের পরিচয় পেশ করছে। তাছাড়া তারা প্রত্যেকেই বাজি ধরছে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে।

বল্ ঘোষণা করল, 'নর্থ সিডনির বক্সার প্রন্টো আজকের লড়াইয়ের বিজয়ীকে পঞ্চাশ পাউন্ড বাজি ধরে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।'

স্যান্ডেল রিঙের মধ্যে লাফিয়ে উঠতেই দশকরা বরাবার হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল। নিজেই জায়গায় গিয়ে বসল স্যান্ডেল। রিঙের বিপরীত কোণ থেকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল টম। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা দুজনে নির্দয় সংগ্রামে জড়িয়ে পড়বে। বিপক্ষকে আঘাতে আঘাতে অচৈতন্য আর ধরাশায়ী করার জন্যে ওরা প্রত্যেকেই তাদের দেহের শেষ বিন্দু শক্তিকেও উজাড় করে দেবে। কিন্তু স্যান্ডেলও টমের মতো রিঙ কস্টিউমের ওপর শেয়েটার আর ট্রাউজার চড়িয়ে রেখেছে, তাই দেখে বিশেষ কিছু বোঝবার উপায় নেই। সুদর্শন মুখশ্রী—মাথা ভর্তি কোঁকড়া ঘন হলদে রঙা চুল। সুপুষ্ট পেশিবহুল ঘাড়টাই তার শক্তিমত্তার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

তরুণ প্রন্টো রিঙের দুপ্রান্তে গিয়ে স্যান্ডেল আর টমের সঙ্গে করমর্দন সেরে নেমে গেল। একের পর এক তরুণ মুষ্টিযোদ্ধারা উঠে আসছে আর তাদের লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। এই মুখগুলো সবারই অপরিচিত কিন্তু যৌবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় তারা সরব—দুনিয়ার মানুষের সামনে তাদের বলিষ্ঠ উচ্চারণ—শক্তি আর নিপুণতার জোরে তারা আজকের বিজয়ী যোদ্ধাকে আগামী দিনে পরাস্ত করবেই করবে। আগে হলে টম কিং মজা পেত, হয়ত বিরক্তিও বোধ করত। লড়াইয়ের আগে এইসব অনুষ্ঠান দেখে এখন কিন্তু আগ্রহই বোধ করছে সে। অজেয় যৌবনকে প্রত্যক্ষ করছে। যৌবন চিরকালই ঠিক এইভাবে দড়ি গলে লাফিয়ে উঠেছে রিঙের ভেতর, উপেক্ষাভরে ছুঁড়ে দিয়েছে উদ্ধত চ্যালেঞ্জ আর বার্ধক্যও চিরকাল নত মস্তকে স্বীকার করে নিয়েছে হার। বৃদ্ধ যোদ্ধাদের মাড়িয়ে সাফল্যের পথে এগিয়ে যায় তরুণরা।

অতৃপ্ত অপ্রতিরোধ্য তরুণের স্রোত বৃদ্ধদের দেয় ভাসিয়ে। তারপর ওই তরুণরাও

একদিন বৃদ্ধ হয়, তারাও আবার সেই একই পতনের পথের পথিক হয়। চিরজয়ী তারুণ্য।

প্রেসবক্সের দিকে তাকিয়ে টম কিং 'স্পোর্টসম্যান' কাগজের মরগ্যান, আর 'রেফরি' কাগজের করবেটকে দেখতে পেয়ে ঘাড় নাড়ল। টম এবার দুহাত উঁচু করে ধরতেই তার সহকারী সিড সুলিভান ও চার্লি বেট্‌স্ গ্লাভস পরিয়ে দিয়ে শক্ত করে ফিতে বেঁধে দিল। স্যান্ডেলের একজন সহকারী কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পরখ করছিল টমের আঙুলের গাঁটের ওপরকার ছোট ছোট ব্যান্ডেজগুলো। ওদিকে টমের একজন সহকারী স্যান্ডেলের কাছে দাঁড়িয়ে একইভাবে নজর রাখছে। স্যান্ডেলের প্যান্টটা টেনে খুলে নিতেই সে উঠে দাঁড়াল। এবার সোয়েটারটা টেনে তুলে নেওয়া হল মাথা গলিয়ে। টম দেখে তারুণ্য মানুষের রূপ ধরে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সুস্থ সবল দেহের গায়ের চামড়ার নিচে মাংসপেশিগুলো জীবন্ত প্রাণীর মতো খেলা করছে। সারা শরীর জুড়ে শুধু চঞ্চল প্রাণের স্বাক্ষর। টম জানে ওর এই সতেজ প্রাণের নির্যাসের একবিন্দুও এখনো অসংখ্য আঘাতজনিত ক্ষতমুখ দিয়ে ঝরে পড়ে নি। লড়াইয়ের পর লড়াইয়ে তার তারুণ্য এখনো খেসারত দিতে শুরু করে নি।

ওরা দুজন এবার এগিয়ে আসে মঞ্চের মাঝখানে। ঘণ্টা পড়তেই সহকারীরা ভাঁজ করা চেয়ার দুটো তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। স্যান্ডেল আর টম করমর্দন সারামাত্র ওদের দেহদুটো যোদ্ধার ভঙ্গি গ্রহণ করল। সূক্ষ্ম কেশের বাঁধন ছিঁড়ে ইস্পাত আর স্প্রিঙে গড়া যন্ত্রের মতো ছটফট করে উঠল স্যান্ডেল। একবার এগিয়ে, একবার পিছিয়ে বাঁ হাতে ঘুষি মারল চোখে, ডান হাতের ঘুষি পাঁজরে, তারপর প্রত্যাঘাত এড়িয়ে লঘুপায়ে নেচে পিছিয়ে এসেও ফের এগিয়ে এল হিংস্র হয়ে। স্যান্ডেল অত্যন্ত তৎপর আর চতুর। চোখ ধাঁধানো প্রদর্শনী। দর্শকরা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। টমের কিন্তু ঠাণ্ডা মাথা। অভিজ্ঞ যোদ্ধা টম এমন ছেলে ছোকরাদের সঙ্গে কতবার যে লড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। স্যান্ডেলের ঘুষিগুলোর সঠিক মূল্য তার জানা। এই ত্বরিত আক্রমণ মারাত্মক নয়। জানা কথা স্যান্ডেল প্রথম থেকেই হুটোপাটি করবে। এটা যৌবনের ধর্ম। বিদ্রোহে উন্মাদ। অফুরন্ত ক্ষমতা আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে যৌবনের দর্পে ফেটে পড়ে। ক্রুদ্ধ আক্রমণে বিপর্যস্ত করে দেয় প্রতিপক্ষকে।

স্যান্ডেল একবার এগোচ্ছে একবার পেছোচ্ছে। একবার এখানে একবার ওখানে। উদ্দীপনা যেন চঞ্চল পায়ে চষে ফেলছে সারা মঞ্চটা। সাদা চামড়া আর মাংসপেশীর আশ্চর্য মহিমা! দেহটা যেন মাকুর মতো উঠছে লাফাচ্ছে পিছলে বেরিয়ে আসছে আর রচনা করছে আক্রমণের এক চোখ ধাঁধানো জাল। আক্রমণের পর আক্রমণ—হাজারো আক্রমণ, কিন্তু লক্ষ্য একটাই। টম কিংকে ধ্বংস করা । টম কিং যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্যান্ডেল আর তার সাফল্যের মাঝখানে । টম অত্যন্ত সহিষ্ণুভাবে সহ্য করে যায় আঘাতগুলো। সে তার করণীয় সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। টম যৌবন পার করে এসেছে তাই যৌবনকে চিনতে আর তার বাকি নেই। যতক্ষণ না স্যান্ডেলের খানিকটা দম বেরোচ্ছে কিছু করবার নেই। টম ইচ্ছে করে মাথা নুয়েই একটা ঘুষি খেল মাথায়। দাঁতে দাঁত টিপে হাসে টম। শয়তানি করেছে ঠিকই কিন্তু খেলার নিয়ম ভেঙে করে নি। নিজের হাতের আঙুলের গাঁট বাঁচাবার দায়িত্ব প্রত্যেকের নিজের । তারপরেও কেউ যদি কারোর মাথার ওপর ঘুষি কষাতে চায়, নিজের ক্ষতি করে—কেউ বাধা দেবে না। টম ইচ্ছে করলে মাথাটা আরেকটু নিচু করতে পারত, তাহলেই ঘুষিটা ফস্কে যেত। টম তা করে নি। কারণ

তার মনে পড়ে গিয়েছিল 'ওয়েলসের আতঙ্ক'-এর মাথায় সেই প্রথম আঙুলের গাঁ ধেঁতলে যাবার কথা। মাথাটা পুরোপুরি নিচু না করার জন্যে স্যান্ডেলেরও আঙুলের একটা গাঁট খতম হয়ে গেছে। অবশ্য এই নিয়ে স্যান্ডেল এখন মাথাও ঘামাবে না। কোনো ভ্রূক্ষেপ না করেই সে এমনি বীরদর্পে আঘাতের পর আঘাত হেনে যাবে লড়াইয়ের শেষ মুহূর্ত অবধি। কিন্তু একদিন আসবেই যখন একের পর এক লড়াইয়ে নামার ফল ফলতে শুরু করবে।

ধেঁতলানো গাঁটগুলোর দিকে তাকিয়ে তখন অনুশোচনা হবে। মনে পড়ে যাবে টম কিং-এর মাথায় ঘুষি মেরে প্রথম আঘাত পাবার কথা।

প্রথম রাউন্ডের পুরো সাফল্যটুকু একা কেড়ে নেয় স্যান্ডেল। ঘূর্ণিঝড়ের মতো তার ক্ষিপ্র আক্রমণ উল্লসিত করে প্রতিটি দর্শককে। ঘুষির বন্যায় টমকে দিশাহারা করে দেয়। টম কিছুই করছে না। একবারও পাল্টা ঘুষি চালায় নি। শুধু আঘাত বাঁচাতে নিজেকে আড়াল করেছে, বাধা দিয়েছে, মাথা নামিয়ে নিয়েছে। সরাসরি আঘাত পেয়ে কখনো আবার ভান করেছে যেন মাথা ঘুরে গেছে। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে শ্লথ ভঙ্গিতে সরে এসেছে। একবারও লাফায় নি বা ঝাঁপিয়ে পড়ে নি। শরীরের এক বিন্দু শক্তিও অপচয় করে নি। স্যান্ডেলের ফেনিল যৌবন সম্পূর্ণভাবে উপচে না পড়া পর্যন্ত বিচক্ষণ প্রবীণ প্রতিশোধ নিতে সাহস পায় না। টমের প্রতিটি গতিবিধি মন্থর হলেও সুসংবদ্ধ সুশৃঙ্খল। ওর ক্লান্ত অলস চোখের দৃষ্টি ভ্রম সৃষ্টি করে—মনে হয় ও বুঝি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। আসলে কিন্তু কিছুই ওর দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। কুড়ি বছরেরও বেশি দড়ি ঘেরা মঞ্চের ভিতর কাটানোর সুবাদে তার চোখের নজর তৈরি হয়ে গেছে। আসন্ন আঘাতের আশঙ্কায় চোখের পাতা কাঁপে না বা পড়ে না। শীতল চোখ দুটো শুধু চেয়ে থাকে আর দূরত্বের মাপ নেয়।

প্রথম রাউন্ডের পর রিঙের কোণে বসে নির্ধারিত এই মিনিটকাল বিশ্রাম উপভোগ করছিল টম। পা দুটো ছড়িয়ে দিয়েছে—হাতদুটোর ভর রেখেছে পিছনের দড়ির ওপর। সহকারীরা তোয়ালে নেড়ে বাতাস করছে আর বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে টম। পেট আর বুক ঘনঘন ওঠানামা করছে। চোখ বন্ধ করে রেখেছে টম। কানে আসছে দর্শকদের নানা প্রশ্ন, 'লড়ছ না যে টম?'—'তুমি ওকে ভয় পাচ্ছ নাকি?'

'সব পেশি আড়ষ্ট হয়ে গেছে।' সামনের আসন থেকে একজনকে মন্তব্য করতে শুনল। 'এরচেয়ে তাড়াতাড়ি নড়তে পারে না। স্যান্ডেলের ওপর নগদ বাজি ধরছি—টু টু ওয়ান।'

ঘণ্টা পড়তেই দুজনে নিজেদের জায়গা ছেড়ে সামনে এগিয়ে এল। টম যত না এগোয় স্যান্ডেল তিনগুণ। স্বভাবতই স্যান্ডেল ব্যগ্র। টম কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট। এটা এত হিসেবি মনোবৃত্তির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। টমের ট্রেনিঙ জোটে নি, ভালো করে খাওয়াও হয় নি, কাজেই প্রতিটি পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া পাক্কা দু মাইল হেঁটে এসেছে। ঠিক প্রথম রাউন্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটছে এবারেও। ঘূর্ণিঝড়ের মতো স্যান্ডেলের আক্রমণ আর নিষ্ক্রিয় টম কিং। ক্ষুব্ধ দর্শকরা বারবার জানতে চাইছে টম কেন লড়ছে না, টম শুধুই ভান করছে। যাও বা দু একটা ঘুষি মেরেছে তার পিছনে না ছিল গতি না কোনো শক্তি । নিজেকে আড়াল করা আর সরিয়ে নেওয়া ছাড়া কিছুই করে নি। স্যান্ডেল চাইছে লড়াইয়ের মধ্যে ক্ষিপ্রতা আনতে, কিন্তু অভিজ্ঞতার জোরে টম তাকে সে সুযোগ দিচ্ছে না একেবারে। ব্যথাভরা অদ্ভুত এক ধরনের চাপা হাসির আভাস ফুটে উঠেছে টমের আঘাত জর্জরিত ভাঙাচোরা মুখটায়। এমন ব্যাকুলভাবে নিজের ক্ষমতাকে কয়েদ করে রাখার সামর্থ্য শুধু

বয়সের সঙ্গেই আসে। স্যান্ডেল মানেই যৌবন আর যৌবন নিজের শক্তি সামর্থ্যকে এমনি অবহেলা ভরেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। রিঙের অধিনায়ক কিন্তু টম। একের পর এক তিক্ত সুদীর্ঘ যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুবাদে সে অর্জন করেছে তার বিচক্ষণতা। স্থির দৃষ্টিতে ঠাণ্ডা মাথায় নজর রাখছে টম। মন্থর পদক্ষেপ । স্যান্ডেলের সফেন যৌবন উপছে না পড়া পর্যন্ত সে অপেক্ষাই করবে। অধিকাংশ দর্শকই ভাবে যে স্যান্ডেলের সঙ্গে টমের কোনো তুলনাই চলতে পারে না। বাজির হার বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় তিনে এক। এরই মধ্যে কিন্তু কিছু বিজ্ঞ লোকও আছে। এরা আগে টমের লড়াই দেখেছে। তারা টমের ওপরেই বাজি ধরে নিশ্চিন্ত মনে।

যথারীতি তৃতীয় রাউন্ডের শুরু থেকেই স্যান্ডেলের একতরফা আক্রমণ শুরু হয়। তিরিশ সেকেন্ড পেরোবার পর স্যান্ডেলেরই অসাবধানতায় একটা সুযোগ পেয়ে যায় টম। তার চোখ ঝলসে ওঠে আর তারই সঙ্গে তড়িৎ-গতিতে এগিয়ে আসে ডান হাত। এই তার প্রথম মার—পেঁচানো ডান বাহুর কঠিনতা আর আধ ঘুরন্ত দেহের পুরো ভারসমেত হুক করেছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন একটা সিংহ যেন আচমকা বাজ পড়ার মতো থাবা বসিয়ে দিয়েছে। আঘাতটা চোয়ালের ধারে লাগা মাত্র গলা কাটা গরুর মতো লুটিয়ে পড়ল স্যান্ডেল। দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে সভয়ে বাহবা জানাল। লোকটা তাহলে একেবারে অচল নয়, ঘুষিটা যা ঝেড়েছে কামারশালার হাতুড়ির মতো।

স্যান্ডেল হতভম্ব হয়ে গেছে। মেঝের ওপর এক পাক গড়িয়ে উঠে বসতে যায় কিন্তু তার সহকারীরা চিৎকার করে বারণ করে দেয় উঠতে। রেফারির সময় গণনা শেষ না হওয়া অবধি বিশ্রাম নেবার জন্যে উপদেশ দেয়। একটা হাঁটু মুড়ে তার ওপর দেহের ভার রেখে বসে স্যান্ডেল, যাতে যে কোনো মুহূর্তে উঠে দাঁড়াতে পারে। রেফারি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এক দুই তিন করে জোরে জোরে গুণে চলে প্রতিটি সেকেন্ড। নয় গোনা হতেই যোদ্ধার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল স্যান্ডেল। টমের আপসোসের অন্ত নেই। ঘুষিটা যদি আর এক ইঞ্চি ওপাশে চোয়ালের ঠিক ভাঁজটায় পড়ত, পুরো নকআউট হয়ে যেত স্যান্ডেল। তিরিশটা ডলার পকেটে পুরে সোজা বাড়ি ফিরে যেতে পারত । বৌ আর বাচ্চারা ওরই পথ চেয়ে বসে আছে।

পুরো তিন মিনিট পার করে রাউন্ড শেষ হবে। স্যান্ডেল এবার তার প্রতিপক্ষকে সমীহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। টমের কিন্তু সেই আগের মতোই মন্থরগতি, ঘুম-জড়ানো দৃষ্টি। রিঙের পিছনে সহকারীদের অপেক্ষা করতে দেখেই টম বুঝতে পারে রাউন্ড শেষ হবার সময় হয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যায় সে। লড়াইটাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে শুরু করে যাতে ক্রমশ সে তার নিজের দিকের কোণটার কাছে এগিয়ে আসতে পারে। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে টম তার টুলটার ওপর বসে পড়ে। স্যান্ডেলকে কিন্তু কোনাকুনিভাবে হেঁটে পুরো মঞ্চটা পার হয়ে নিজের জায়গায় পৌঁছতে হয়। ব্যাপারটা সামান্য কিন্তু এই রকম অনেকগুলো সামান্য ব্যাপার যখন একসঙ্গে দানা বাঁধে তখন আর তা সামান্য থাকে না। ওই কপা বেশি হাঁটতে বাধ্য হয়েছে স্যান্ডেল, ওইটুকু শক্তি বেশি খরচ করেছে, বিশ্রামের অত্যন্ত মহার্ঘ এক মিনিট সময়ের থেকেও কয়েক সেকেন্ড খোয়া গেছে। প্রতি রাউন্ডের সূচনায় টম অত্যন্ত মন্থরভাবে অগ্রসর হয়েছে আর স্যান্ডেলকে বেশি করে হাঁটিয়েছে। আবার প্রতিটি রাউন্ডের সমাপ্তির সময় দেখা গেছে চতুর টম ঠিক স্বস্থানে ফিরে এসেছে। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়েছে নিজের টুলে।

আরো দু রাউন্ড খেলা হয়ে গেছে। টম তার শক্তি ব্যয়ে যতটা কৃপণ, স্যান্ডেল ঠিক

ততটাই বেহিসেবি। স্যান্ডেল খেলার গতি বাড়াবার জন্যে সচেষ্ট হলে টম অস্বস্তিতে পড়ে। স্যান্ডেলের অসংখ্য আঘাতের মধ্যে বেশ কিছু লক্ষ্যভেদ করেছে। তবু টম তার শুধভঙ্গি ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক। মাথাগরম ছোকরারা ওদিকে চেঁচিয়ে আসর মাত করছে—টমকে লড়তে বলছে। ষষ্ঠ রাউন্ডে স্যান্ডেল আবার অসতর্ক হতেই ডান হাতের ভয়াবহ ঘুষি এসে পড়ে তার চোয়ালে। আবার রেফারি নয় গোনা অবধি পড়ে থাকে সে। সপ্তম রাউন্ডেই স্যান্ডেলের অতি উৎসাহ ঝিমিয়ে আসে। বুঝতে পারে এটা তার জীবনের কঠিনতম লড়াই। টম কিং বুড়ো হতে পারে কিন্তু এ অবধি সে টমের মতো যোদ্ধার সম্মুখীন হয় নি। বুড়ো টম কক্ষনো মাথা গরম করে না, তার আত্মরক্ষার কৌশল নিখুঁত, তার ঘুষির আঘাত যেন মুগুরের ঘা। তাছাড়া তার ডান বাঁ দুহাতেই নক-আউট। তাহলেও টম কিন্তু বারবার আঘাত হানতে সাহস পায় না। আঙুলের ভাঙা গাঁটগুলোর কথা সে ভোলে নি। শেষ পর্যন্ত লড়তে হলে খুব বুঝেসুঝে প্রতিটি আঘাত হানা প্রয়োজন। টুলে বসে ও প্রান্তে স্যান্ডেলের দিকে তাকিয়ে টমের মনে হল ওর অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্যান্ডেলের যৌবনকে যদি যুক্ত করা যেত, সেটা নিশ্চিতভাবে বিশ্বহেভিওয়েট চাম্পিয়ানের জন্ম দিত। কিন্তু মুশকিল এই যে স্যান্ডেল কোনোদিনই বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হবে না। তার সে বিচক্ষণতা নেই। একমাত্র তার যৌবনকে বিকিয়েই সে তার অভিপ্রায় পূর্ণ করতে পারে। তারপর একদিন সে বিচক্ষণতা অর্জন করবে ঠিকই, কিন্তু ততদিনে তার যৌবন ফুরিয়ে যাবে।

যতরকমভাবে সম্ভব টম সুযোগ নিতে কসুর করে না। সুবিধে পেলেই সে আঁকড়ে ধরছে বিপক্ষকে। আর আঁকড়ে ধরার মুহূর্তে বলতে গেলে প্রতিবারই তার কাঁধটা স্যান্ডেলের পাঁজরে আঘাত করছে। মুষ্টিযুদ্ধের হিসেবে ঘুষির মতোই কার্যকর কাঁধটা । তাছাড়া এতে শক্তির অপচয়ও হয় অপেক্ষাকৃত কম। একবার আঁকড়ে ধরতে পারলে টম তার পুরো দেহের ওজনটা ছেড়ে দেয় বিপক্ষের ওপর। দুজনকে ছাড়িয়ে দেবার জন্যে তখন রেফারির হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। টম যখনই কাঁধ দিয়ে স্যান্ডেলের পাঁজরে গোঁত্তা মেরে ওকে জাপটে ধরে, ওর মাথাটা থাকে স্যান্ডেলের বাঁ হাতের তলায়। স্যান্ডেল এই রকম সময় তার পিঠের দিক দিয়ে ডান হাত চালিয়ে টমের মুখে আঘাত করে। স্যান্ডেলের এই মারের চাতুর্য দর্শকদের সহর্ষ তারিফ পায় কিন্তু তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারে না। শক্তির অহেতুক অপচয়। স্যান্ডেলের কিন্তু ক্লান্তি নেই, কোনো বিকার নেই। টম মুচকি মুচকি হাসে আর সহ্য করে যায় মারগুলো।

স্যান্ডেল এবার ডান হাতে পরপর কবার জোরাল ঘুষি চালায়। দেখে মনে হয় টম দারুণ মার খাচ্ছে। প্রাচীন মুষ্টিযোদ্ধারা কিন্তু তারিফ দেয় টমকেই। স্যান্ডেল যেই ঘুষি চালাতে যাচ্ছে টমের বাঁ হাতের গ্লাভস্‌টা নিপুণভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে স্যান্ডেলের ডান হাতের গুলি। ঘুষিগুলো টমের গায়ে এসে লাগছে ঠিকই কিন্তু তার শক্তি হরণ করে নিচ্ছে টমের ওই সামান্য স্পর্শটুকু। নবম রাউন্ডের শুরুতে এক মিনিটের মধ্যে টমের ধনুকাকার ডানহাতের আঘাতে পরপর তিনবার স্যান্ডেলের অত ভারি দেহখানা লুটিয়ে পড়ল। প্রতিবারই নয় গোনা অবধি পুরো সময়টার সদ্ব্যবহার করে তারপর স্যান্ডেল উঠে দাঁড়িয়েছে। আঘাতে আঘাতে বিহ্বল দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু ক্ষমতা হারায় নি। স্যান্ডেলের আর সেই ক্ষিপ্রতা নেই। আগের মতো আর বেহিসেবি শক্তিক্ষয়ও করছে না। দাঁতে দাঁতে টিপে লড়ে যাচ্ছে। তার প্রধান সম্পদ যৌবনের ভাঁড়ার থেকে যথেচ্ছ ঋণ গ্রহণ করে চলেছে। টমের প্রধান সম্পদ কিন্তু অভিজ্ঞতা। তেজ আর প্রাণশক্তিতে ভাঁটা পড়ার সঙ্গে সযত্নে সুদীর্ঘ যোদ্ধা জীবনের অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে ঘাটতিটুকু পূরণ করে নিয়েছে চাতুর্য।

নিজের দৈহিক শক্তির অপব্যয় রোধ করার জন্য একটিও বাড়তি অঙ্গ সঞ্চালন তো নয়ই উপরন্তু প্রতিপক্ষকে সেই একই ভুল করতে বাধ্য করার কৌশল জানে টম। হাত পা আর দেহের ছলনাময় ভঙ্গিতে বারবার সে প্রলুব্ধ করছে স্যান্ডেলকে। অহেতুক স্যান্ডেল লাফিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে, ঘাড় নোয়াচ্ছে বা আক্রান্ত হবার ভয়ে প্রতিরোধমূলক ভঙ্গি গ্রহণ করছে। টম ঠিক সুযোগ করে অবসর নিচ্ছে লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে, কিন্তু স্যান্ডেলকে এক মুহূর্ত নিশ্চেষ্ট থাকতে দিচ্ছে না। এটা পরিণত বয়সের নীতি।

দশম রাউন্ডের শুরুতেই টম বিপক্ষের আক্রমণ রোধ করতে সোজা স্যান্ডেলের মুখের উপর বাঁ হাতের ঘুষি ঝেড়ে গেল পরপর কবার। স্যান্ডেল শেষপর্যন্ত পাল্টা কৌশল হিসেবে টমের বাঁ হাতের ঘুষিগুলো মাথা নুইয়ে এড়িয়ে গিয়ে ডান হাতের হুক্ ঝাড়তে শুরু করল টমের মাথায়। আঘাতগুলো ঠিক জায়গা মতো না লাগায় কার্যকর হয় নি। কিন্তু প্রথম আঘাতটা লাগার পর অচেতনতার সেই সুপরিচিত কালো পর্দাটা নেমে এসেছিল টমের দুচোখে, সেই মুহূর্তটিতে বা সেই মুহূর্তের এক ভগ্নাংশখানেক সময় টম হারিয়ে গিয়েছিল। আঘাত পাবার আগের মুহূর্তেও দেখেছিল স্যান্ডেল তার মার এড়াতে দৃষ্টিপথ থেকে সরে যাচ্ছে—দেখেছিল অগণিত দর্শকের মুখগুলো ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। তারপরই অন্ধকার। আবার দৃষ্টি ফিরে পেতেই সেই দর্শকদের মুখ আর স্যান্ডেলকে দেখতে পেল টম। এতক্ষণ ঘুমোবার পর এই যেন চোখ খুলল। তবে সংজ্ঞাহীন মুহূর্তটি তিলমাত্র স্থায়ী হয়েছিল বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়বারও সময় পায় নি টম। দর্শকরা দেখে টম টলমল করছে, হাঁটুর জোর হারিয়ে ফেলেছে। পরক্ষণেই অবশ্য বাঁ কাঁধের আশ্রয়ে থুতনি গুজে নিজেকে সামলে নেয় টম।

পর পর কবার একই পদ্ধতিতে আক্রমণ চালিয়ে যায় স্যান্ডেল। টম শেষ পর্যন্ত বিহ্বলতা কাটিয়ে আত্মরক্ষার এবং পাল্টা আক্রমণের উপায় বের করে। বাঁ হাতে ঘুসি মারবার ভণিতা করে আধ পা পিছনে সরে এসে সম্পূর্ণ শরীরের ওজনটুকু কাজে লাগায় ডান হাতের আপারকাট মারে। সময়ের নির্ভুল বিচারে আঘাতটা সোজা গিয়ে পড়ে স্যান্ডেলের মুখের ওপর। আঘাতের প্রচণ্ডতা স্যান্ডেলকে শূন্যে তুলে আছড়ে ফেলে। তার মাথা আর কাঁধে চোট লাগে। পরপর দুবার স্যান্ডেলকে একইভাবে ধরাশায়ী করে তারপর দড়ির ওপর ফেলে ঘুসির বন্যা বওয়ায়। স্যান্ডেলকে এক মুহূর্ত অবসর দেয় না সামলে ওঠার—মুহুর্মুহু আঘাতে জর্জরিত করে দেয়। উত্তেজনায় সিট ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রতিটি দর্শক। অবিরাম হর্ষধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ চঞ্চল। কিন্তু অসামান্য শক্তি আর সহ্যক্ষমতা স্যান্ডেলের । এখনো পায়ের ওপর ভর রেখে দাঁড়িয়ে আছে। স্যান্ডেলের নক-আউট হওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে এই বীভৎস অত্যাচারের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে পুলিশের এক ক্যাপ্টেন রিঙের ধারে উঠে আসে লড়াই থামিয়ে দেবার জন্যে। ঠিক এমনি সময় ঘণ্টাধ্বনি রাউন্ডের সমাপ্তি ঘোষণা করে। টলমল করে নিজের জায়গায় ফিরে আসে স্যান্ডেল। পুলিশের ক্যাপ্টেনের কাছে প্রতিবাদ জানায় লড়াই বন্ধ করার চেষ্টা করছে বলে। লড়বার শক্তি আর সামর্থ্য দুটোই তার অটুট আছে। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে সে দুবার লাফিয়ে উঠে সরে আসে পিছনে। পুলিশের ক্যাপ্টেন আর হস্তক্ষেপ না করে ফিরে যায়।

পিঠে ঠেস দিয়ে টুলের ওপর হতাশভাবে বসে আছে দমছুট টম। লড়াইটা বন্ধ হয়ে গেলে রেফারি বাধ্য হত টমকে জয়ী ঘোষণা করতে—কড়কড়ে ডলারগুলো চলে আসত পকেটে। টম তো আর স্যান্ডেলের মতো যশ এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে লড়ছে না, ওর লড়াই শুধু তিরিশটা ডলারের জন্যে। আবার এক মিনিট অবসর পেয়ে গেল

স্যান্ডেল, এর মধ্যেই খানিকটা সামলে উঠবে নিশ্চয়।

তরুণের জয় সুনিশ্চিত—কে যেন টমের কানের কাছে গুণ গুণ করে উঠল। টমের মনে পড়ে গেল স্টাউশার বিলকে হারাবার পর সে রাতে ও কার মুখে যেন এই একই কথা শুনেছিল। টমের এক অনুরাগী সমর্থক সেদিন ওকে ড্রিঙ্কের আহ্বান জানিয়েছিল। সেই বলেছিল কথাগুলো। সে রাতে টমই ছিল তরুণ আর আজ তারুণ্যের প্রতিমূর্তি বসে আছে তার বিপরীত দিকে। আধঘণ্টা হয়ে গেল লড়ছে টম এবং টমের বয়সটা কম নয়। স্যান্ডেলের মতো লড়লে পনের মিনিটের বেশি সে টিকতে পারত না। আসল কথা দুই রাউন্ডের মধ্যবর্তী ওই সামান্য অবসরে ওর স্ফীত শিরা আর আহত ক্লান্ত হৃৎপিণ্ড হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সমর্থ হচ্ছে না। তাছাড়া দুর্বল শরীর নিয়েই সে শুরু করেছে। দুমাইল পথ হেঁটে আসা ঠিক হয় নি একেবারে। তাছাড়া সেই সকাল থেকে তার মাংস খাবার দুর্নিবার বাসনাটাও মেটে নি। কসাইরা ওকে ধার দিতে রাজি হয় নি মনে পড়তেই একরাশ ঘৃণা উথলে ওঠে। একজন বয়স্ক মানুষের পক্ষে এমন আধপেটা খেয়ে লড়াইয়ে নামা সত্যিই অসুবিধাজনক। এক টুকরো মাংসে আর এমন কী ব্যাপার—কয়েক পেনি তো দাম। কিন্তু সেটুকু জুটলেও আজ হয়ত তিরিশটা ডলার উপার্জন করতে পারত টম।

একাদশ রাউন্ডের ঘণ্টা পড়তেই স্যান্ডেল তেড়ে এল। হাবভাবে যতই চাঙা দেখাতে চাক না কেন আসলে কিন্তু তা নয়। টম জানে পুরোটাই ধাপ্পা। মুষ্টিযুদ্ধে মান্ধাতার আমল থেকেই এই ধাপ্পা চালু। স্যান্ডেলের আক্রমণের প্রথম দমকটার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে টম ওকে প্রথমে আঁকড়ে ধরেছিল। তারপর রেফারি বাঁধন আলগা করে মুক্ত করে দিল স্যান্ডেলকে। টম যা চেয়েছিল তাই ঘটল। বাঁ হাতের ঘুষি মারার ভঙ্গি করতেই স্যান্ডেল এক পাশে কাত হয়ে হাত ঝাঁকিয়ে ঘুষি চালাল। সঙ্গে সঙ্গে আধপা পেছনে সরে মোক্ষম একটি ডান হাতের আপার-কাটে স্যান্ডেলকে ধরাশয়ী করে ফেলল টম। তারপর এক মুহূর্তের অবসর নয়—মারের পর মার, হুক ও ড্রাইভ, হরেক রকমের মারে চুরচুর করে দেয় স্যান্ডেলকে। নিজেও আঘাত পাচ্ছে কিন্তু তার বহুগুণ বেশি আঘাত দিচ্ছে। স্যান্ডেল জড়িয়ে ধরলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে, জড়িয়ে ধরার প্রয়াস পেলেই আঘাত হানছে, মাটিতে লুটিয়ে পড়ার উপক্রম হলে নিজেই একহাতে তাকে টেনে দাঁড় করিয়ে রেখে অন্য হাতের ঘুষির আঘাতে দড়ির গায়ে ঠেলে দিচ্ছে। দড়ির উপর ফেলে দিতে পারলে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পারবে না আরো আঘাত করার সুযোগ মিলবে।

ইতিমধ্যে প্রেক্ষাগৃহ উন্মত্ত। প্রতিটি দর্শক টমের হয়ে চেঁচাচ্ছে, 'শেষ করে দাও। শেষ করে দাও! ওকে শেষ করে ফ্যালো টম।' লড়াইয়ের অন্তিম পরিণতি আসবে ঘূর্ণিঝড়ের দাপট নিয়ে, এই তো চায় বক্সিঙের আসরের দর্শক। আধঘণ্টা ধরে শক্তি সঞ্চয় করে রেখেছে টম এই মুহূর্তটির অপেক্ষায়। অকৃপণভাবেই সেই শক্তিকে এখন সে কাজে লাগাচ্ছে। এই তার একমাত্র সুযোগ—পারে তো এখনই পারবে। খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে টমের শক্তির সঞ্চয়। পুরোপুরি ক্ষমতা হারাবার আগেই স্যান্ডেলকে একেবারে ধরাশায়ী করতে পারবে বলে আশা রাখে টম। টম আঘাত হেনে চলে। প্রতিটি আঘাত ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করা। কতটা শক্তি ব্যয় হচ্ছে আর কতটা ক্ষতি করতে পারছে তারই চুলচেরা বিচার। স্যান্ডেলের মতো একজনকে নকআউট করা যে কী কঠিন তা সে উপলব্ধি করছে এখন। অসামান্য সহ্যশক্তি তার। এ হিম্মত শুধু তাজা যৌবনেরই থাকে। স্যান্ডেল মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে নাম করবেই। এই রকম কঠিন পেশিতন্তু দিয়ে তৈরি হয় সার্থক যোদ্ধাদের দেহ।

স্যান্ডেল টলমল করে কিন্তু টমের পায়ে খিঁচ ধরছে, হাতের গাঁটগুলো বিদ্রোহ করছে। তবু নিজেকে শক্ত করে টম। ভয়ঙ্করভাবে ঘুষি চালায়। প্রতিবার আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে তার জীর্ণ আহত হাতদুটো অশেষ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে। নিজে কোনো আঘাত পাচ্ছে না তবু স্যান্ডেলের মতোই প্রতি মুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়ছে সে। ঘুষিগুলো ঠিক জায়গাতেই পড়ছে কিন্তু ঘুষিতে আর সেই জোর নেই। ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তির ফসলমাত্র। টম এখন পা ঘষড়ে ঘষড়ে নড়াচড়া করছে। দুর্বলতার লক্ষণটা চোখে পড়া মাত্র স্যান্ডেলের সমর্থকরা চিৎকার করে উৎসাহিত করতে চায় তাকে।

আবার প্রচণ্ড রূপ ধরে টম। পরপর দুটো ঘুষি চালায়—বাঁ হাতের মারটা লাগে একটু উঁচুতে, সোলার প্লেক্সাসে। ডান হাতেরটা এসে পড়ে চোয়ালের ওপর। মারে তেমন জোর ছিল না। কিন্তু স্যান্ডেল এত দুর্বল, এতই বিহ্বল যে সঙ্গে সঙ্গে সে কাটা ছাগলের মতো লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে শুরু করে দিল। রেফারি তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সময় গণনা শুরু করে দিল। দশ সেকেন্ড হাঁকার মধ্যে উঠে দাঁড়াতে না পারলেই হার। পুরো প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে উদগ্রীব নীরবতা। কম্পিত পায়ে দাঁড়িয়ে আছে টম। মৃত্যুকালীন আচ্ছন্নতা যেন তাকে ঘিরে ধরেছে। সমবেত দর্শকদের মুখগুলো সমুদ্রের মতো দোল খাচ্ছে, কাছে আসছে, দূরে সরে যাচ্ছে, আর বহুদূর থেকে যেন কানে ভেসে আসছে রেফারির সময় গণনা—এক—দুই—

এরপরেও যৌবনই একমাত্র মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। স্যান্ডেলও উঠে দাঁড়াল। চার গোনা হতেই সে গড়িয়ে গিয়ে উপুড় হয়ে শুল। অন্ধের মতো দড়িটা ধরার জন্যে ছটফট করতে লাগল। সপ্তম সেকেন্ডে কোনোক্রমে ঘষড়ে ঘষড়ে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঠে বসল। মাতালের মতো কাঁধের ওপর মাথাটা এলোমেলো দুলছে। রেফারি 'নয়' হাঁকা মাত্র সিধে উঠে দাঁড়াল স্যান্ডেল। আত্মরক্ষার সঠিক ভঙ্গিতে বাঁ হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে, ডান হাতে ঢেকেছে পেট। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটি সুরক্ষিত করে বেতালা পা ফেলে টমের দিকে এগিয়ে এল স্যান্ডেল। আশা করছে টমকে জাপটে ধরে আরো খানিকটা সময় কাটিয়ে দিতে পারবে।

স্যান্ডেল উঠে দাঁড়ানো মাত্র দুবার ঘুষি চালায় টম। দুবারই কিন্তু তার আঘাত গিয়ে পড়ে স্যান্ডেলের ভাঙা করা হাতের বর্মের ওপর। পর মুহূর্তেই স্যান্ডেল মরিয়া হয়ে আকড়ে ধরে টমকে। দুজনকে ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টায় হাত লাগায় রেফারি। টমও চেষ্টা করে মুক্তি পাবার। টম জানে যুবকরা কত তাড়াতাড়ি সামলে ওঠে। স্যান্ডেল যদি সামলে ওঠার সময় না পায় টমের জয় সুনিশ্চিত। একটা সোজা আঘাতই যথেষ্ট। স্যান্ডেলকে সে যে-প্যাঁচে ফেলেছে জয় তার অবধারিত। মুষ্টিযুদ্ধের রীতিনীতি ও কৌশল—সব দিক দিয়েই সে পরাস্ত করেছে স্যান্ডেলকে। জট খুলে যাওয়ায় স্যান্ডেল এবার দূরে সরে গেছে। টিকে থাকা না থাকার এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে দোদুল্যমান স্যান্ডেল । একটি উত্তম মার এখুনি ওকে লুটিয়ে ফেলে খেলার নিষ্পত্তি করে দিতে পারে। মাংস খেতে না পাবার কথাটা আবার খেয়াল হতেই তিক্ততায় ভরে ওঠে সমস্ত মনটা। মাংসটুকু পেলে হয়তো এই মুহূর্তে তার ঘুষিটা ঠিক প্রয়োজনমতো জোরালো হতে পারত। সমস্ত স্নায়ুর শক্তি একত্রিত করে টম ঘুষি মারল কিন্তু তাতে না আছে জোর, না আছে গতি। স্যান্ডেল টলে গেল কিন্তু পড়ল না। কোনোরকমে সরে এসে দড়ি ধরে দাঁড়াল। টমও বেসামাল পায়ে ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে হতাশাগ্রস্ত মানুষের শেষ চেষ্টা হিসেবে আবার ঘুষি চালাল। কিন্তু ওর দেহের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। আছে শুধু লড়াকু মনোভাব—তাও ম্লান ঝাপসা হয়ে এসেছে

ক্লান্তিতে। যে আঘাতটা চোয়ালের ওপর পড়ার কথা সেটা কাঁধের ওপর এল। আরো উঁচতে ঘুষিটা চালাতে চেয়েছিল টম কিন্তু ক্লান্ত মাংসপেশি তার সেই আদেশ পালন করতে পারে নি। উল্টো আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় সে নিজেই টলমল করে ওঠে, আরেকটু হলেই পড়ে যেত। আবার চেষ্টা করে টম। এবার পুরোপুরি লক্ষ্যভ্রষ্ট। অপরিসীম ক্লান্তিতে স্যান্ডেলের গায়ের ওপর আছড়ে পড়ে । স্যান্ডেলকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে নিজের পতন রোধ করে।

টম নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে না। আর তার করার কিছু নেই। টম ফুরিয়ে গেছে। জয়লাভ করেছে যৌবন। আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকার সময়েই টম অনুভব করে স্যান্ডেল শক্তি ফিরে পাচ্ছে। রেফারি ওদের ছাড়িয়ে দেবার পর টম দেখে সাক্ষাৎ যৌবন কেমন বলীয়ান হয়ে উঠছে প্রতি মুহূর্তে। প্রথম দিকে স্যান্ডেলের ঘুষিতে কোনো জোর ছিল না, আদৌ কার্যকর হয় নি। কিন্তু ক্রমেই জোরালো আর নির্ভুল হয়ে উঠছে তার মারগুলো। ঝাপসা চোখে টম দেখে গ্লাভস্ পরা একটা হাত তার চোয়াল লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে হাত তুলে আঘাত বাঁচাতে চায় টম। কিন্তু মন চাইলেও দেহ পারে না। হাত তো নয় যেন কয়েক মণ সিসে। এমনিতে উঠতে চায় না হাতটা, তাই ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তাকে ঠেলে তুলতে চায় টম। গ্লাভস্ পরা হাতটা এসে পড়ল টমের চোয়ালে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হবার মতো একটা শুধু ঝলক—সঙ্গে সঙ্গে আঁধারের ওড়না এসে ঢেকে দিল টমকে।

টম চোখ খুলে দেখল সে রিঙের ধারে নিজের জায়গায় বসে আছে। বন্ডির সমুদ্র উপকূলে ঢেউয়ের গর্জনের মতো ভেসে আসছে দর্শকদের চিৎকার। স্পঞ্জে করে তার ঘাড়ে জল দেওয়া হচ্ছে। মুখ আর বুকের ওপর ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে সিড সুলিভান তাকে চাঙ্গা করতে চাইছে। হাতের গ্লাভস্ দুটো আগেই খুলে নেওয়া হয়েছে। স্যান্ডেল ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে করমর্দন করছে। টমকে আজ হারিয়ে দিয়েছে স্যান্ডেল কিন্তু তার জন্যে ওর প্রতি একটুও বিরূপ বোধ করে না টম। উৎফুল্লভাবেই করমর্দন করে। আঙুলের চাপে ভাঙা গাঁটগুলো অত্যন্ত পীড়া দেয়। স্যান্ডেল এবার মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। তরুণ যোদ্ধা প্রন্টোর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে আর বাজির পরিমাণ বাড়িয়ে একশো ডলার করে দেয়। ম্রিয়মাণভাবে তাকিয়ে থাকে টম। সহকারীরা ওর মুখ থেকে জল মুছে মঞ্চ পরিত্যাগের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। হঠাৎ ক্ষুধার্ত বোধ করে টম। খিদের জ্বালা নয়—একটা অবশ ভাব, জঠরের অভ্যন্তরে একটা দপদপানি যেটা সারা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে । টমের মনে পড়ে যায় লড়াইয়ের সেই বিশেষ মুহূর্তটার কথা। স্যান্ডেলের তখন পুরোপুরি বিপর্যস্ত বেসামাল অবস্থা। পরাজয়ের গহ্বরে তাকে তলিয়ে দিতে পারত টম অতি সহজেই। মাংসটুকু যদি খেতে পেত—ওই বাড়তি ক্ষমতাটুকু নিশ্চয় থাকত তার। শেষ আঘাতের পেছনে সামান্য একটু ক্ষমতার অভাবই টমের পরাজয় ডেকে এনেছে। শুধু মাংসটুকু খেতে না পাবার জন্যেই হেরে গেল টম।

দড়ির ফাঁক গলে বেরোবার সময় টমকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল সহকারীরা। তাদের সরিয়ে দিয়ে টম নিজেই মাথা নিচু করে দড়ি পেরিয়ে ভারী পায়ে মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নামল। সহকর্মীরা ভিড় সরাতে লাগল আর টম তাদের পিছু পিছু চলল। ড্রেসিঙরুম থেকে বেরিয়ে হলঘরটা পেরিয়ে রাস্তায় পা দিতে যাবে, পেছন থেকে কয়েক জন ছোকরা বলে উঠল, 'অমন সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিলে কেন?'

'বেশ করেছি!' এক কথায় উত্তর সেরে সিঁড়ি কটা টপকে রাস্তায় এসে নামল টম।

মোড়ের মাথায় পাবলিক হাউসের সুইঙ-ডোরটা খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। টম দেখল

ভিতরে ঝলমল করছে আলো, হাসিমুখে মহিলারা ড্রিংক পরিবেশনে ব্যস্ত, আজকের লড়াই নিয়ে আলোচনা চলছে, বারের ওপর প্রচুর মুদ্রার ঝনঝনানি। কে যেন চেঁচিয়ে ড্রিঙ্কের আমন্ত্রণ জানাল। একটু থমকে দাঁড়িয়েছিল টম তারপর আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করে এগিয়ে চলল।

পকেটে একটা আধলা নেই। দুমাইল হেঁটে ফেরা সোজা কথা নয়। সত্যিই বয়স হয়ে যাচ্ছে টমের। ডোমেন পেরিয়ে হঠাৎ রাস্তার ধারে একটা বেঞ্চির ওপর বসে পড়ল টম। ভাবতেই মনটা দমে যাচ্ছে যে লড়াইয়ের ফলাফল জানবার জন্যে ওরই পথ চেয়ে ওর বৌ হাঁ করে বসে আছে বাড়িতে। লড়াইয়ে নকআউট হওয়ার চেয়েও ঢের ভয়াবহ এখন ওর সম্মুখীন হওয়া। কী করে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে ভেবে পায় না টম।

অত্যন্ত দুর্বল লাগে। সারা শরীর যেন জ্বলছে। হাতের ভাঙা গাঁটগুলো স্মরণ করিয়ে দেয় মাটি কাটার কাজ পেলেও এক সপ্তাহের আগে কোদাল বা বেলচা চালতে পারবে না। খিদেটা যেন আগুন হয়ে জ্বলছে পেটের মধ্যে। অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছে। নিজের অসহায় অবসন্ন অবস্থা দেখে ভেঙে পড়ে টম। অবাঞ্ছিতভাবে ভিজে ওঠে দুচোখ। দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় বহুদিন আগে স্টাউশার বিলকে হারাবার রাতটার কথা। বেচারা স্টাউশার। এতদিনে টম বুঝতে পারে স্টাউশার কেন সেদিন ড্রেসিঙরুমে বসে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।